ঘরে বাইরে শরৎচন্দ্র

রমেন দাস

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৪৯

প্রকাশক
এস. এন. পাল
সাহিত্য সংস্থা
৯, নবীন পাল লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১/এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

প্রাপ্তিস্থান
সুহাস পাবলিশিং হাউস
১৮সি, টেমার লেন
কলকাতা-৯

রেবা

ও

অলোককে

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।

—রবীন্দ্রনাথ

সবিনয় নিবেদন

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে যেসব বিচিত্র চরিত্র এঁকেছেন, সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সেইসব চরিত্র অতি পরিচিত। শরৎচন্দ্রের রচনার অত্যধিক জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠিও বোধহয় সেখানে।

শরৎচন্দ্র শুধুমাত্র কল্পনায় ভর করেননি। বাস্তব অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল উপাদান। এবং সেসব উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি লোকভয়, সমাজ-সংস্কার নিঃশঙ্কোচে অগ্রাহ্য করেছেন, মিশেছেন সমাজের নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে। শরৎচন্দ্রের সেই বিচিত্র এবং দুঃসাহসিক জীবন-বৃত্তান্ত তাঁর সাহিত্যে সৃষ্ট প্রায় সব চরিত্রকেই হার মানায়। কখনও তিনি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসায় পাগল, শ্মশানে-মশানে নানা অভিযানে অথবা নাগা সন্ন্যাসীর বেশে কখনও উদাসীন, আবার কখনও-বা গান্ধীজী, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনারূপে দিল্লী-গয়া-লাহোরের রাজনৈতিক মঞ্চে উপস্থিত। তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের চোখে ধুলো দিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে কথাশিল্পীর গোপন এবং দুঃসাহসিক যোগসূত্রের খবর সেদিন ক'জন জানতেন বা রাখতেন? সেইসব অজস্র অজ্ঞাতপ্রায় এবং দুর্লভ কাহিনী নিয়েই 'ঘরে বাইরে শরৎচন্দ্র'।

সে যুগের যে ক'জন প্রতিনিধি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন তাঁদের সহায়তা, পুরানো দিনের সাময়িক পত্র-পত্রিকা, শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের 'স্মৃতিকথা' এবং একালের শরৎ-বিষয়ক নানা পুস্তক আমার এ গ্রন্থ রচনার মূল সূত্র। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই আমি ঋণী। কৃতীগবেষক ও সাংবাদিক বন্ধুবর ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপকবন্ধু মিলন দত্তের পরামর্শ ও

সক্রিয় সহযোগিতা এ গ্রন্থ রচনায় বিশেষভাব সাহায্য করেছে। অধ্যাপকবন্ধু বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এবং হাওড়ার খ্যাতিমান আইনজীবী সুব্রত ব্যানার্জীর আন্তরিক সহায়তাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এই গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রয়োজনীয় নেপথ্য তথ্যসহ রচনা-প্রকাশনার কাল এবং সংক্ষিপ্ত 'জীবনধারা' বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাসাহিত্যের ছাত্র, শরৎ-অনুরাগী এবং ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে তা বিশেষ সহায়ক হবে বলেই মনে করি। এ গ্রন্থের সমাদর মূলতঃ শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তারই প্রমাণ দেবে। পরিশেষে বলা যায়: 'ঘরে বাইরে শরৎচন্দ্র' কথাশিল্পীর জন্মশতবর্ষের একটি শ্রদ্ধার্ঘ—একটি বিনম্র প্রণাম!

রমেন দাস

সূচীপত্র

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দুই বিয়ে। প্রথমা স্ত্রী শান্তি দেবী বিয়ের মাত্র দু'বছরের মধ্যে মারা যান। সঙ্গে একটি শিশু সন্তানও।

অপর স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী অবশ্য সারাজীবনই কথাশিল্পীর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। দু'টি বিয়েই কথাশিল্পীর জীবনের দু'টি নাটকীয় ঘটনা।

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে চাকুরি করেন। প্রবাসে নিঃসঙ্গ জীবন। বেশ রাত্রি করে বাড়ি ফেরেন। একদিন বাড়ি ফিরেই দেখেন কে যেন ঘরে ঢুকে ভেতর দিক থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। শরৎচন্দ্র অবাক। তিনি যে ঐ ঘরে একাই থাকেন। অবাক শরৎচন্দ্র এবার সজোরে কড়া নাড়েন। হঠাৎ দরজা খুলে যায়। তারপরই তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে এক তরুণী। সচকিত শরৎচন্দ্র সঙ্কোচ বোধ করেন। তিনি পেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না। তরুণী তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে ওঠে : আমায় বাঁচান।

প্রথমে শরৎচন্দ্র ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। দেখলেন, মেয়েটি তখনও ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এবার ভাল করে তার মুখের দিকে তাকালেন। খেয়াল হল তাদের বাড়ির নিচুতলার এক ভাড়াটের মেয়ে। ওর বাবা চক্রবর্তী মশাই। অবস্থা খুব ভালো নয়। মিস্ত্রির কাজ করেন। মেয়েটির মা নেই। শরৎচন্দ্র ঐ শরণাপন্নাকে শান্ত হতে বললেন। তারপর তার দুঃখের নানা কথা শুনে বিচলিত হলেন। অবশেষে মেয়েটিকে তাঁর ঘরে সেই রাত্রের মতো থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন।

পরদিন ভোরে উঠেই শরৎচন্দ্র সোজা হাজির হলেন মেয়েটির বাবার কাছে। তিনি জানতেন, কিছু নেশাখোর আর মাতালের সঙ্গে মেয়েটির বাবার বড্ড মাখামাখি। প্রতি সন্ধায় তারা এসে

চক্রবর্তী মশাই-এর ঘরে আড্ডা বসায়, আর মেয়েটি বাধ্য হয় তাদের ফুট-ফুরমায়েস খাটতে। ঐ আড্ডারই জনৈক ঘোষালবাবুর সঙ্গে নাকি চক্রবর্তী তার মেয়ের বিয়ে প্রায় ঠিক করে রেখেছিলেন। ঘোষালবাবুর বয়েস বেশি হলেও তাঁর বেশ টাকাকড়ি ছিল। ভাত-কাপড়ের জন্য আর মেয়েকে ভাবতে হবে না। একটু নেশা করেন, তাতে আর এমন কি আসে যায়।

নেশার ঘোরে সেই সন্ধ্যায় ঘোষালবাবু নাকি ঐ মেয়েটিকে নিজের পত্নী বলে দাবি করে তাদের অন্দরের মধ্যে তাড়া করেন। তারপরই মেয়েটি ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেয় শরৎচন্দ্রের ঘরে।

শরৎচন্দ্র মেয়েটির বাবার কাছে গিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করতেই উল্টে বিপদে পড়েন। চক্রবর্তী মশাই বলেন: মেয়ে আমার বিয়ের যোগ্য। কিন্তু আমি যে ভীষণ গরীব। বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভাল পাত্র পাওয়াও মুস্কিল। ঘোষালের টাকাকড়ি আছে, থাক না একটু নেশার দোষ। বেটাছেলের পক্ষে ওটা তেমন কোন দোষের ব্যাপার নয়। চক্রবর্তীর কথা শুনে শরৎচন্দ্র তাঁকে অনেক কথা বলেন এবং কিছু বোঝাতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। অবশেষে চক্রবর্তী মশাই আচমকা এক প্রস্তাব করে বসেন: গরীবের জন্য যদি তোমার এতই দরদ বাপু, তুমিই এই বাঙালী ব্রাহ্মণের জাতকুল রক্ষা করো না?

প্রস্তাব শুনে শরৎচন্দ্র বিস্মিত। কি জবাব দেবেন ভেবে পান না। মুহূর্তেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো আগের রাত্রের অসহায় মেয়েটির করুণ-কাতর দু'টি চোখ। কথাশিল্পীর কাছে তখন বাহ্যিক রূপগুণের বিচার নেই। একবাক্যে সম্মতি জানালেন। সম্মত হলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা শান্তি দেবীকে বিয়ে করতে।

ঐ বিবাহ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনস্থ বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন: শরৎচন্দ্র স্বজাতীয় কোন ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্র বেশীদিন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। যৌবনে তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন।...

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ে সম্বন্ধে কবি নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: মধ্যে মধ্যে অল্প কয়েকদিনের জন্য বাংলাদেশে এসে ভাই-বোনদের খবর নিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। এমনি এক আসা-যাওয়ার মাঝে হিরন্ময়ী দেবী নামে এক অসহায়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মেদিনীপুর নিবাসী ৺কৃষ্ণদাস অধিকারীর কন্যা।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরন্ময়ী দেবীর বিয়ে কোথায় হয় তা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ বলেন: কৃষ্ণদাসবাবু রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করলে তিনি সেখানে বসেই হিরন্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেন। এদিকে শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বেহালার মনীন্দ্র রায়ের একটি রচনা থেকে জানা যায়: মেদিনীপুরে যখন তিনি (শরৎচন্দ্র) ছিলেন, তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করে তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করেছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজেই নাকি তাকে এ কথা বলেছিলেন।

হিরন্ময়ী দেবী রূপবতী ছিলেন না। লেখাপড়াও তিনি তেমন জানতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল স্বভাবের এবং ধর্মভীরু। বিয়ের বছর কয়েকের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক পত্রে লিখেছিলেন: ইনি তো দিনরাত জপতপ পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন।

শরৎচন্দ্র অবশ্য বিয়ের পর হিরন্ময়ী দেবীকে কিছুটা লেখাপড়া শেখান। এবং তার ফলে তিনি একটু-আধটু লিখতে-পড়তেও

জানতেন। প্রসঙ্গতঃ শরৎচন্দ্রের আরেকটি পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। বন্ধুবর প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন…একটু-আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই, তুমি লিখে যাও—স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সুবিধা হল না। 'বরং' লিখতে জিজ্ঞাসা করেন, অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব ? না বাহির দিয়ে দেব ? অর্থাৎ 'ং' হবে না 'ঃ' হবে ?

হিরন্ময়ী দেবীর রূপ-গুণ, শিক্ষার বিচারে না গিয়েও একটা কথা বলা যায় যে কথাশিল্পীর দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর। হিরন্ময়ী দেবীকে একলা রেখে শরৎচন্দ্র খুব কম সময়ই বাইরে কোথাও থেকেছেন। এ নিয়ে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র একবার বিশেষ কাজে বাইরে যান। সেদিন রাত্রে আর ফিরতে পারেন না। পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শোনেন তার স্ত্রী হিরন্ময়ী সারাদিনে জলগ্রহণ করেননি। খোঁজ নিয়ে তিনি পরে জানতে পারেন যে, স্বামীর পাদোদক বা চরণামৃত গ্রহণ না করে পতিব্রতার জলস্পর্শ করা অনুচিত। ঐ কারণেই হিরন্ময়ী দেবী সারাদিন উপবাসে কাটিয়েছেন।

সরল এবং ধর্মভীরু স্ত্রীর বিশ্বাসে কখনও তিনি আঘাত করেননি। তাঁর পাদোদকের অভাবে স্ত্রী যাতে আর উপবাসী না থাকেন পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তারপর থেকে পারতপক্ষে শরৎচন্দ্র কোন রাত্রেই আর বাইরে থাকতেন না। হিরন্ময়ীর 'পতিভক্তি' কথাশিল্পীকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল।

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্যা কবি রাধারাণী দেবীর কাছ থেকে পাদোদক প্রসঙ্গে একটা ঘটনা জানা গেছে। শরৎচন্দ্র জীবনের সায়াহ্নে এসে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে কাছে

ডাকেন এবং নানা বিষয় খোঁজ-খবর নেন। তারপর কথাশিল্পীর নির্দেশে বড় একটি পাত্র ভর্তি জল আনা হয়। শরৎচন্দ্র তাতে একবার পা ডুবিয়ে তুলে নেন এবং স্মিতহাসি হেসে বলেন : চরণামৃতের অভাবে তুমি যেন আবার উপবাসী থেকো না। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রকে তারপর নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়, এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পুলিশসাহেব : প্রতিশোধ

শরৎচন্দ্র তখন ভাগলপুরে—মামাবাড়ি। বয়েসে তরুণ। সঙ্গী রাজু তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সকাল-সন্ধ্যা দুপুর-রাত্রি যখন-তখন দুই বন্ধু একত্রিত হয় নানা কাজে, অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এক সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের বন্ধু রাজু বেড়াতে বেরিয়েছে। এমন সময় স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক রাজুকে দেখেই কেঁদে উঠলেন। লজ্জা-ঘৃণা আর ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বলেন : রাজু তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলাম।

বিস্মিত রাজু শিক্ষক মশাইকে প্রশ্ন করেন : কী হয়েছে আপনার ?

: এই দ্যাখো, বলেই তিনি গায়ের চাদর খুলে দেখালেন তাঁর পিঠে চাবুকের দাগ। তিনি বললেন : টিউশনি করতে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম, টমটম গাড়ি চেপে পুলিশ-সাহেব যাচ্ছে। তার গাড়ি দেখেই আমি পথ ছেড়ে দাঁড়াই। কিন্তু কেন জানি না, হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করিয়েই সপাং সপাং চাবুক মারতে মারতে আমাকে বললে : দেখছো না কে যাচ্ছি—পথ ছেড়ে দাঁড়াতে পারো না ?

রাজু বুঝলো, পুলিশ-সাহেব রোজকার মতো ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলতে গেছে। সে আর কোন মন্তব্য করলো না। মাষ্টারমশাইকে

বাড়ি ফিরে যেতে বলে ছুটে গেলো বন্ধুবর, সকল কাজের সাথী, শরৎচন্দ্রের কাছে।

শরৎচন্দ্র সব শুনে অবাক। দুই বন্ধু পরামর্শ করলো: যে করেই হোক মেজাজী সাহেবকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। তারপর দুই বন্ধু সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওরা জানতো, সাহেব বিলিয়ার্ড খেলে বেশ রাত্রি করে যখন ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরে, তখন আর স্বাভাবিক থাকে না। নেশাগ্রস্ত হয়ে টমটম গাড়ির ঘোড়ার গায়ে জোর চাবুক মারতে মারতে তীব্র বেগে গাড়ি চালায়।

দুই বন্ধু ঐ রাত্রে আদমপুরের ঘাটে গিয়ে এক নৌকার মাঝির কাছ থেকে অতি কৌশলে লম্বা একটি মোটা দড়ি (কাছি) সংগ্রহ করলো। তারপর সাহেবের ফেরার পথের দু'পাশে অন্ধকার জঙ্গলে দু'জন ঐ দড়ির দুই মাথা ধরে বসে রইলো।

দূর থেকে যখন ওরা টমটম গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দড়িটির দুই মাথা দু'পাশের দুটি গাছে কিছুটা উঁচু করে বেঁধে দিলো। পুলিশ-সাহেব প্রতিদিনকার মতো তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরছিলো। ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ে দড়ি লাগায় ঘোড়াটি আচম্‌কা আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব শুদ্ধ গাড়িটিও উল্‌টে পড়লো।

দুই বন্ধু, শরৎ আর রাজু, বোধহয় এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়লো নেশাগ্রস্ত পুলিশ-সাহেবের উপর। তারপর মনের সুখে কিল-চড়-ঘুসি মেরে সাহেবকে কাবু করলো। এবং তার কোমর থেকে রিভলবারটা সুকৌশলে খুলে নিলো। সাহেব তখন নির্জন অন্ধকারে নিঃসঙ্গ, অচৈতন্য।

শরৎ আর রাজু সেই রাত্রে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়ে আদমপুরের ঘাটে যায়। সেখানে নৌকার মাঝিকে দড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে সাহেবের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা রিভলবারটি গঙ্গায় বিসর্জন দেয়। তারপর প্রতিশোধের আনন্দে দুই বন্ধু বাড়ি ফেরে।

শরৎচন্দ্রের ঐ বন্ধু রাজুর পুরো নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। রাজু শরৎচন্দ্রে চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিলো। শরৎচন্দ্র রাজুকে ভালোবাসতো। লেখাপড়া বেশি না জানলেও রাজু গান-বাজনা-অভিনয়ে খুবই পাকা ছিলো। তরুণ রাজুর নানা দুঃসাহসিক অভিযানে কিশোর শরৎচন্দ্র ছিলো বিশ্বস্ত সঙ্গী ও সহায়ক। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আমরা যে ইন্দ্রনাথকে পাই—তা শরৎচন্দ্রের কিশোরবেলার বন্ধু রাজুর প্রতিচ্ছবি বলেই অনেকের বিশ্বাস।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাজুর অন্তরঙ্গতা এবং ডিঙি অভিযান সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে শরৎচন্দ্র বৈকালটা বাড়িতে কাটাতেন না। বইখাতা রেখে কিছু জলখাবার খেয়ে তিনি বেরুতেন। রাজুর সঙ্গে ছোট ডিঙিতে চড়ে বেরুনো···ডিঙি করে রোজ বেরুনো চাই। কোন কোন দিন ফিরতে রাত হ'ত।

গঙ্গাযাত্রা : গঙ্গাস্নান

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে সেবার শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি যাত্রা হচ্ছিল। সাত গাঁয়ের মানুষ যাত্রা দেখতে.ভেঙে পড়লো। কিশোর শরৎচন্দ্রও সেই ভীড়ে একজন উৎসুক দর্শক। এমন সময় তার বন্ধু রাজু ছুটে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো : তোমাকেই খুঁজছিলাম শরৎ। চলো, এক্ষুণি যেতে হবে।

দু'জন যাত্রার আসর ছেড়ে বাইরে গেলো। রাজু বললো : জানো শরৎ, ও পাড়ার একটা দু-তিন বছরের ছেলে কলেরায় মারা গেছে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। অনেক চেষ্টা করেও আর বাঁচানো যায়নি। বাড়িতে ভীষণ কান্নাকাটি। গ্রামের লোকজন সকলেই যাত্রা শুনতে এসেছেন। তার ওপর আবার কলেরার মরা।

সুতরাং সৎকারের জন্য কোন লোকজন পাওয়া যাচ্ছে না। চলো, আমরা ছেলেটার সৎকার করে আসি।

যে কথা সেই কাজ। আর মুহূর্ত দেরী নয়। শরৎচন্দ্র আর রাজু সেই গভীর রাত্রেই মৃত শিশুটি নিয়ে শ্মশানে হাজির।

গভীর ঐ রাত্রে নির্জন শ্মশানঘাটে গঙ্গার পারে ওরা নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধকে দেখে প্রথমটায় চমকে উঠলো। দেখলো, শ্মশানঘাটে সে শুয়ে আছে। দুই বন্ধু এগিয়ে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলো। শুনলো: দিন তিনেক আগে গঙ্গাযাত্রী ঐ বুড়োকে শ্মশানের ঘাটে আনা হয়েছে। কিন্তু গঙ্গাযাত্রায় আনা হলেও গঙ্গার হাওয়ায় বৃদ্ধ বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। তার আর মৃত্যু হয়নি। তাই যারা তাকে গঙ্গাযাত্রায় এনেছে, তারাও বিরক্ত। পাশের গ্রামে যে যাত্রা গান হচ্ছে, তা শুনতে সেই যাত্রীরা সেখানে চলে গেছে। বৃদ্ধ তাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় নির্জনে শ্মশানঘাটে শুয়ে।

বৃদ্ধের কথা শুনে দুই বন্ধুর মন বেদনায় ভরে উঠলো। জ্যান্ত মানুষকে গঙ্গাযাত্রার নামে ঐভাবে ফেলে রাখার কথা তারা ভাবতেও পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু কী যেন পরামর্শ করলো। তারপর বৃদ্ধকে বললো: চলো, আমরা তোমাকে তোমার বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

বৃদ্ধের মুখে বেদনার ম্লান হাসি দেখা গেলো। সে বললো: কী বাপু, আমাকে যে বাড়ির লোকজন গঙ্গযাত্রায় পাঠিয়েছে। একবার গঙ্গাযাত্রী হয়ে এলে আর বাড়ি ফিরতে নেই। তাতে সকলেরই অমঙ্গল হয় শুনেছি।

ওরা বললে: কে বলেছে ফিরতে নেই? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আর এখন মরবে না। এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। তুমি বরং আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলো। নয়তো যারা তোমাকে গঙ্গাযাত্রায় নিয়ে এসেছে, বিরক্ত হয়ে তারাই তোমাকে গলা টিপে মেরে রেখে যাবে।

বৃদ্ধ ওদের কথায় ভরসা পেলো। নতুন জীবনের আশায় মৃত্যু-

পথযাত্রীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটলো। বললো: ঠিকই বলেছো তোমরা। ক'দিন ধরে ওরা ঐ ধরনের কথাবার্তাই বলছিলো।

রাজু এবার বললো: ভয় নেই তোমার। সৎকারের কাজটা আমরা আগে সেরে নিই। তারপর তোমাকে আমরাই তোমার বাড়ি পৌঁছে দেবো। আজকের রাতটা বরং তুমি আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

এবার রাজু আর শরৎ মৃত শিশুটির সৎকারের ব্যবস্থা করলো। তারপর গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান করে বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ালো।

রাজু-শরৎ এরপর আর বিশ্রামের কথা ভাবলো না। দুই বন্ধু অর্ধমৃত বৃদ্ধকে কোলে-কাঁধে নিয়ে সেই গভীর রাত্রে বাড়ির পথে রওনা হলো।

কিশোরবেলায় সাথী রাজুর সঙ্গে বহু দুঃসাহসী অভিযানে শরৎচন্দ্র সঙ্গী হয়েছিলেন। কখনও শ্মশানে, কখনও গভীর রাত্রে গঙ্গার বুকে, আবার কখনও-বা যাত্রা-অভিনয়ের আসরে। কৈশোরে শরৎচন্দ্র বন্ধু রাজুর সঙ্গী হয়ে মুক্ত জীবনের যে আস্বাদ পেয়েছেন, পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যজীবনে নানাভাবে তার প্রকাশ ঘটেছে। পরিণত বয়সে যখনই রাজুর প্রসঙ্গ উঠেছে, শরৎচন্দ্র বলেছেন: রাজুর কথা কোনদিনই আমি ভুলতে পারবো না। সে আমাকে অনেক কিছু দিয়ে গেছে। তার সে দানের ঋণ শোধ হবার নয়।

নিরুদ্দেশ : সন্ন্যাস জীবন : কর্তব্যজ্ঞান

বিলাত ফেরৎ এবং উদারপন্থী হিসেবে রাজা শিবচন্দ্র তখন ভাগলপুরে বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তি। তিনি নানা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেন। দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল ছিলো বলেই হয়তো কোন কুসংস্কারকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারতেন

না। এবং তার পরিণামে স্থানীয় রক্ষণশীল সমাজের কাছে তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। কাউকে পরোয়া না করে তিনি নিয়মিতভাবে রাজা শিবচন্দ্রের বাড়ি যাতায়াত করতেন। রাজা শিবচন্দ্রের ছেলের সঙ্গে সেই সুবাদে শরৎচন্দ্রের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক সময় দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বও বেশ গভীর হয়। শরৎচন্দ্র তখন তাঁর ঐ বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের ক্লাবে অভিনয় করতেন, গান-বাজনায় অংশ নিতেন। এ ব্যাপারটা গ্রামের একশ্রেণীর মানুষ ভালোভাবে নিতে পারেন না। ঐ অপরাধে শরৎচন্দ্রকে তাঁরা 'সমাজচ্যুত' করলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাতেও দমলেন না। গোঁড়ামি আর সামাজিক কুসংস্কারের কাছে তিনি নতি স্বীকার না করে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আগের মতোই তিনি চলতে লাগলেন। শিবচন্দ্রের বাড়িতে যাতায়াত বজায় রাখলেন।

শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি সেবার জগদ্ধাত্রী পুজো। পুজো উপলক্ষে গ্রামের বহু লোক নিমন্ত্রিত। নিমন্ত্রিতরা যখন খেতে বসলেন, শরৎচন্দ্র গেলেন সেখানে খাবার পরিবেশন করতে। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে নিমন্ত্রিতরা সকলে হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বললেন : না, শরৎকে তো সমাজচ্যুত করা হয়েছে। সুতরাং সে পরিবেশন করলে কেউই জলস্পর্শ পর্যন্ত করবেন না।

প্রকাশ্যভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি ঐ আচরণ বোধহয় তাঁকে ব্যথিত, পীড়িত ও মর্মাহত করলো। মনের দুঃখে আর অভিমানে তিনি কাউকে কিছু না বলেই ভাগলপুর থেকে নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন আত্মাভিমানী। স্বজন-পরিজন, অথবা বন্ধুবান্ধব-প্রিয়জনের কাছ থেকে তিনি কখনও কোন আঘাত সহ্য করতে পারতেন না। আরেকবার তাঁর বাবার কাছ থেকে সামান্য গালমন্দ শুনে কাউকে কিছু না বলেই, তিনি নিরুদ্দেশ হন।

ঘটনাটি ঘটে কয়েকটি পাথরের টুকরো নিয়ে। শরৎচন্দ্রের বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের ঝোঁক ছিলো রকমারি পাথর সংগ্রহ করা। মূল্যবান সেইসব পাথরের টুকরো তিনি সযত্নে একটি বাক্স-বন্দী

করে রাখতেন। পাথরগুলি নানা রঙের, দেখতেও বেশ সুন্দর ছিলো। শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর এক বন্ধুকে ঐ পাথরগুলি দিয়ে দেন। তাতে তাঁর বাবা অত্যন্ত রেগে যান এবং শরৎচন্দ্রকে গালমন্দ করেন।

ঐ প্রসঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেব বলেছেন: যে পিতার কাছে শরৎচন্দ্র এতদিন শুধু অপরিমিত স্নেহলাভেই অভ্যস্ত ছিলেন, যে পিতা বহুবার বহু দোষ হাসিমুখে ক্ষমা করেছেন—কখনও কোন কটুকথা বলেননি—তাঁর এই রূঢ় তিরস্কারে অভিমানী শরৎচন্দ্র মনের দুঃখে সেই দিনই গৃহত্যাগ করে পুনরায় নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

মজঃফরপুরের এক বাঙালী ক্লাবে সে-বছর এক তরুণ সন্ন্যাসী গিয়ে হাজির। প্রবাসী বাঙালীরা সেখানে বসে হালকা আলোচনা, গল্প-সল্প করছিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর হঠাৎ উপস্থিতি সকলকেই কৌতূহলী করে তুললো। সন্ন্যাসী তখন বেশ স্পষ্ট হিন্দিতে বললেন: আমাকে একটু কালি-কলম দেবেন?

সন্ন্যাসীর কথায় সবাই বিস্মিত। ইতিমধ্যে তাকে কে একজন কালি-কলম দিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাঁর ঝুলি থেকে একটি পোষ্ট-কার্ড বার করে তাতে কী যেন লিখতে শুরু করলেন। কৌতূহলীদের উৎসুক দৃষ্টি কিন্তু এরমধ্যেই আবিষ্কার করলেন: সন্ন্যাসী পরিষ্কার বাংলায় ঐ পোষ্টকার্ডে কী যেন লিখছেন।

ব্যাপারটা নিয়ে ক্লাবঘরে বেশ গুঞ্জন উঠলো। সকলেই সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতে চাইলেন। সকলের পক্ষ থেকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য এগিয়ে গেলেন। এবং বাংলায় প্রশ্ন করলেন: আপনার পরিচয়?

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে হিন্দিতে উত্তর দিলেন। দু'জনের মধ্যে বাংলা-হিন্দির বিনিময় চললো অনেকক্ষণ। তারপর প্রমথবাবু একটু কৌতুক ভরেই বললেন: সাধুবাবা, মনে হচ্ছে আপনি বাংলা জানেন। তাই হিন্দি ছেড়ে বাংলাতেই কথা বলুন না। ঐ হিন্দি শুনে শুনে যে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি।

শরৎচন্দ্র এবার আর তাঁর আসল রূপ চেপে রাখতে পারলেন না।

সন্ন্যাসী বেশী শরৎচন্দ্র হো-হো করে হেসে উঠলেন। এবং তারপর বাংলায় গল্প-সল্প, আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন।

সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গিয়ে উঠেছিলেন এক ধর্মশালায়। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি ধর্মশালার ছাদে বসে আপন মনে গান গাইতেন। তাঁর মিষ্টি গলার গান আশেপাশের মানুষকে আকৃষ্ট করতো। সাধুবাবার গান শুনতে এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে অনেকেই এসে সেখানে ভীড় জমাতেন। ঐ গানের আসরেই একদিন নিশিনাথ নামে এক যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নিশিনাথ ছিলেন সাহিত্যিকা অনুরূপা দেবীর সম্পর্কে এক আত্মীয়।

ঐ প্রসঙ্গে অনুরূপা দেবী লিখেছেন :

…তিনি (নিশিনাথ) একদিন আসিয়া বলেন, একটি বাঙালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়, অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বিহারী বলিয়াই পরিচয় দিলেন। কিন্তু তা নয়—লোকটা বাঙালীই। একদিন নিয়ে আসব তাকে ? গান শুনবে ? তাঁর খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে, তোমার এখানে রাখতে পারলে ভাল হয়।…

বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা এক একদিন ভাল কোন গায়ক পাওয়া গেলে গান-বাজনা আসর বসিত। নিশিনাথ একদিন শরৎবাবুকে লইয়া আসেন। ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ির অতিথিরূপে এইখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতোই ছিল।…

শরৎবাবুর মধ্যে কতগুলি বিশেষ গুণ ছিল। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এইসব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন।

মজঃফরপুরে থাকবার সময় গায়ক হিসাবে শরৎচন্দ্রের বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গীতের মাধ্যমে সেখানকার জমিদার মহাদেব সাহুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। জমিদার সাহু শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত এবং মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হন এবং তাঁর বাড়িতে থাকবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। ঐ সময় সাহুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গতাও বেড়ে যায়। সঙ্গীত সাধনা ছাড়াও তখন তিনি সাহুর বাড়িতে সাহিত্য সাধনায় মন দেন। যতদূর জানা যায় 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে একখানি উপন্যাস তিনি সেখানে বসেই রচনা করেন।

সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধনা আর বন্ধুদের নিয়ে প্রবাসে যখন শরৎচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের ধারা নানা খাতে বয়ে চলেছে, সেই সময়, ১৯০২ সালের মাঝামাঝি, শরৎচন্দ্র তাঁর বাবার মৃত্যু-সংবাদ পান। ঐ দুঃসংবাদ পেয়েই বিচলিত শরৎচন্দ্র ভাগলপুর যাত্রা করেন। যাত্রার সময় 'ব্রহ্মদৈত্যর' পাণ্ডুলিপি সাহুর কাছে রেখে যান। কিন্তু পরে উপন্যাসের সেই পাণ্ডুলিপিটি আর পাওয়া যায়নি।

ভাগলপুরে ফিরে এবার শরৎচন্দ্র এক দুর্দশার সাগরে পড়লেন। তিনটি নাবালক ভাইবোন নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন, কী করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না। নিঃস্ব শরৎচন্দ্র কোনরকমে পিতৃ-শ্রাদ্ধ সেরে বুঝলেন, আর ভাবাবেগ নয়—। অভাবী সংসারের ক্ষুধা আর ভাইবোনেদের করুণ চোখমুখ তাঁকে বাস্তবমুখী করে তুললো। তিনি স্থির করলেন, চাকুরি করবেন—ভাইবোনেদের দুঃখ দূর করবেন। বাবার অবর্তমানে নাবালক ভাইবোনেদের দায়দায়িত্ব নিয়ে মানুষ করে গড়ে তোলার কর্তব্য তিনি ভুলতে পারলেন না। তাই আত্মীয়স্বজন-বন্ধুদের কাছে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে তিনি কলকাতার পথে যাত্রা করলেন।

কলকাতা থেকে রেঙ্গুন : আবার কলকাতা

…পরঘরী হয়ে থাকার চেয়ে, পথে থাকাও ঢের আরামের।… কি জঘন্য কাজ করি। তার জন্য পাই মাসে ত্রিশটি করে টাকা। এতে ভদ্রতা থাকে না। ভালো একটা চাকুরি পাই যদি তো সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে কেন, সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত যেতে পারি। …কলকাতা এসে শরৎচন্দ্রের চাকুরি জীবনের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়, সে-সম্পর্কে তিনি তাঁর বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঐ খেদোক্তি করেন।

কলকাতা এসে তিনি ২৫, কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—এই ঠিকানায় উঠলেন। ওখানে থাকতেন তাঁর সম্পর্কিত মামা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন কলকাতা হাই-কোর্টের অ্যাডভোকেট। ঐ সময় বিহারের একটা অংশ বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই হাইকোর্টের বহু মামলা-মোকর্দমার নথিপত্র হিন্দিতে লেখা থাকতো। হিন্দিতে লেখা সেইসব নথিপত্র ইংরাজিতে তর্জমা করাই ছিল শরৎচন্দ্রের কাজ। তার জন্য তিনি ত্রিশ টাকা করে বেতন পেতেন।

শরৎচন্দ্র যখন তাঁর প্রথম জীবনের ঐ চাকুরিতে বীতশ্রদ্ধ, এবং দূর সম্পর্কের ঐ মামাবাড়ির ব্যবহারে অতিষ্ঠ—সে সময় অর্থাৎ ১৯০২ সালের ডিসেম্বরে, রেঙ্গুন থেকে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় বেড়াতে আসেন। অমায়িক অঘোরবাবু রেঙ্গুনের একজন নামকরা অ্যাডভোকেট ছিলেন। কাঁসারিপাড়ার বাড়িতে শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের মধ্যে যে একটা আত্মীয়তা আছে তাও জানতে পারেন। অঘোরবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তায় মুগ্ধ হন। তিনি কথায় কথায় বর্মাদেশের নানা গল্প শরৎচন্দ্রকে শোনান। শরৎচন্দ্রও অবাক হয়ে তা শোনেন। এবং ভাবেন : সম্পর্কে তো

অঘোরবাবু মেসো, তায় আবার আলাপী এবং অমায়িক মানুষ। একবার রেঙ্গুনে পাড়ি জমালে হয় না? তখনকার মতো মনের সাধ তিনি মনেই চেপে রাখেন। তা প্রকাশ করার সুযোগ অথবা সাহস কোনটাই পান না।

এক মাসও পার হলো না। আত্মীয়স্বজন কাউকে কিছু না জানিয়ে শরৎচন্দ্র আবার একদিন উধাও। সেটা ১৯০৩ সালের গোড়ার কথা।

তখনকার দিনে ডাক নিয়ে যেসব জাহাজ কলকাতা থেকে রেঙ্গুন যেতো, শরৎচন্দ্র সেরকম একটি ডাকবাহী জাহাজের যাত্রী হলেন। বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে জাহাজ চললো বর্মার পথে। প্রায় চারদিন বাদে বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছুলো সেই জাহাজ।

ইতিমধ্যে রেঙ্গুনে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দিল। রেঙ্গুনের চিকিৎসক এবং সরকারী মহলের ধারণা ছিল—জাহাজের কুলিরা একদেশ থেকে অন্যদেশে যাতায়াত করে। এবং ঐসব কুলিদের মাধ্যমেই ঐ রোগের বিস্তার ঘটে। সেই কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জাহাজের কুলিশ্রেণীর লোকদের রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে একটি দ্বীপে নামিয়ে দিনকয়েক আটক রাখা হতো। তারপরে তাদের শহরে প্রবেশের অনুমতি দিতো। শরৎচন্দ্র যেহেতু কম পয়সার যাত্রী হয়ে জাহাজের ডেকে চেপে রেঙ্গুন যাত্রা করেছিলেন, সাহেবরা তাঁকেও কুলি শ্রেণীভুক্ত মনে করে সেই দ্বীপে নামিয়ে দেয়। এবং দিনকয়েক সেখানে তাঁকে আটকে রাখে।

দিন সাতেক প্রায় বন্দী থাকার পর শূন্য হাতে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন শহরে যান এবং তাঁর সেই সম্পর্কিত মেসো অঘোরবাবুর বাড়ি খুঁজে বের করেন।

শরৎচন্দ্রকে দেখে অঘোরবাবু অবাক: উস্‌কোখুস্‌কো চুল, পরণে ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া শার্ট, পায়ে একজোড়া চটি আর

কাঁধে গামছা। ঐ অবস্থায় শরৎচন্দ্রকে দেখে অঘোরবাবু চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ছুটে গিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন। এবং সেইদিন থেকেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে অঘোরবাবুর কাছে আশ্রয় পেলেন। অঘোরবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীও শরৎচন্দ্রকে নিজের ভায়ের মতোই সাদরে গ্রহণ করলেন।

অঘোরবাবু নিজে ছিলেন রেঙ্গুনের প্রখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী। শরৎচন্দ্রকেও তিনি আইন পড়ার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দিলেন। তবে তখনকার দিনে বর্মায় আইন পড়তে হলে বর্মা ভাষাও শিখতে হতো। অঘোরবাবু তাই বর্মার ভাষা শেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে একজন গৃহশিক্ষকও রেখে দিলেন।

ঐ সময় অঘোরবাবু শরৎচন্দ্রকে একটি চাকুরিও জোগাড় করে দেন। চাকুরি পেয়ে শরৎচন্দ্রের আনন্দের সীমা রইলো না। ভাবলেন : চাকুরি করতে করতে আইন পড়া শেষ করবেন এবং পরে আইন ব্যবসা শুরু করবেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যা ভাবলেন, বাস্তবক্ষেত্রে হলো তার বিপরীত। কিছু দিনের মধ্যেই আঘোরবাবুর মৃত্যু হল। অঘোরবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনে আবার বিপর্যয় দেখা দিল। অঘোরবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। শরৎচন্দ্র আবার নিরাশ্রয়। আবার নতুন আত্মীয় অথবা স্বজনের সন্ধান শুরু করলেন।

হাস্যপরিহাস প্রিয় এবং মজলিসী মানুষ শরৎচন্দ্রের নানা গুণে রেঙ্গুনের মনীন্দ্রকুমার মিত্র খুব প্রীত হন। তিনি ছিলেন বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস আফিসের ডেপুটি একজামিনার। ঐ অফিসে মনীন্দ্রবাবু শরৎচন্দ্রকে একটা চাকুরি করে দিলেন। শরৎচন্দ্র তখন মিত্রের বাড়িতেই বসবাস শুরু করেন। এমনি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাসজীবনে তাঁর দিন কাটতে লাগলো।

শরৎচন্দ্র যে অফিসে কাজ করতেন সেই অফিসের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে, ১৯১১-১২ সালে, বর্মার এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস একীভূত হয়। এবং সেই থেকে শরৎচন্দ্রের অফিসের নামকরণ

হয় অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিস। ততদিনে শরৎচন্দ্রের বেতন যদিও মাসিক ত্রিশ টাকা থেকে নব্বুই টাকায় উঠেছে, তাতেও যেন শরৎচন্দ্রের মন ভরছিল না। কেননা, নিজের খরচ ছাড়াও ভাইবোনেদের জন্য দেশে তাঁকে টাকা পাঠাতে হতো। তাই আরও অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি ঐ সময় রেঙ্গুনে একটি চায়ের দোকান খোলেন। তিনি নিজেই ঐ প্রসঙ্গে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ২২-৩-১২ তারিখে লেখেন: ···চাকুরি করি। নব্বুই টাকা মাহিনা পাই, দশ টাকা এলাউয়েন্স পাই। একটা ছোট দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় কোনমতে কুলাইয়া যায়, এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।···

চাকুরি করার ফাঁকে দোকান চালানো কম কথা নয়। তাই শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রেমিক দোকান করেছেন শুনে স্থানীয় বন্ধুরা তো অবাক। ঐ বিষয় সব শুনে এবং দেখে তাঁর বন্ধু সতীশ চন্দ্র দাস শরৎচন্দ্রকে বলেন: দোকান করেছো ভালো। চাকুরি ছেড়ে ঐ চায়ের দোকানে নিজেকেই বসতে হবে। নইলে দুদিনেই সব সাবাড় হয়ে যাবে।···

শরৎচন্দ্র তার উত্তরে অত্যন্ত অভিজ্ঞের মতো বলেন: না হে, না। বসতে হবে না। জানো, আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? এক টিন দুধে কত চিনি মেশাতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে আমি সব ঠিক করে নিয়েছি। সকালবেলা দুধের টিন কিনে দোব, সারা দিন কত টিন দুধ খরচ হবে, সন্ধ্যাবেলা তার হিসাব করলেই পয়সা ধরা পড়বে।···

শরৎচন্দ্রের ঐ বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও বাস্তববুদ্ধি কতটা ছিল! বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের ঐ দোকান বেশিদিন চলেনি।

১৯১৬ সালের গোড়ার কথা। হঠাৎ শরৎচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোথাও কিছু নেই। তাঁর পা দুটো ভীষণভাবে ফুলে

গেল। ডাক্তার দেখালেন। কিন্তু কেউই তাঁকে নিরাময় করে তুলতে পারলেন না। বরং অনেকেই সুপারিশ করলেন: বর্মা ছাড়লে যদি ঐ রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। স্থানীয় জলবায়ু ঐ ধরনের রোগের বিস্তার ঘটায়।

ঐ বছরই ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন:··· শুনি বর্মা দেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোনদিন এও ছাড়ে না। তাই দু'এর এক বোধ করি অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে।···ভয় হয়, হয়তো বা চিরজীবনের মতো পঙ্গু হইয়া যাইব। এই সম্ভাবনা মনে করিতেও যেন পারি না। যাহাকে যথার্থই বলে ভয়ে 'পেটের ভাত চাল' হইয়া যাওয়া—আমার তাই হইয়াছে। সুতরাং ডিস্‌পেপ্‌সিয়াও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। কারণ—খাও দাও, স্নান কর, লেখা-পড়া কর, কিন্তু চলিয়া বেড়াইবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে হজম হওয়াও বন্ধ হইয়া আসে। ডান পায়ের হাঁটুর নিচে হইতে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড! অথচ গোদ নয়—কী যে ডাক্তারেরা তাহাও বলিতে পারে না। কতদিনে সারিবে, কিংবা কোনদিন সারিবে কিনা এ খবরও তাঁরা দিতে পারেন না।···আমার এই কাঠির মতো শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে, তাহাও মনে করি নাই।···

প্রবাসজীবনে শারীরিক অসুস্থতা এবং দেশে রেখে আসা ভাই-বোনেদের চিন্তায় শরৎচন্দ্র দিনদিন বিব্রত হতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর শরীরও ভেঙে পড়লো। তার ওপর অফিসের কাজেও নানারকম ঝামেলা দেখা দিল।

শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অশান্তির জন্য বেশ কিছুদিন যাবতই অফিসের কাজে শরৎচন্দ্রের তেমন মন বসছিলো না। অথচ অফিসের কাজে ঢুকবার পর তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। আপন কর্মক্ষমতা ও কৃতিত্বে তাঁর পদোন্নতিও হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র একদিন দেরী করে অফিসে যান। তার জন্য সেকশন

সুপারিনটেনডেণ্ট এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তাঁর উদ্দেশে কয়েকটি কড়া কথা এবং আপত্তিজনক মন্তব্য প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত আত্মাভিমানী এবং সেনটিমেণ্টাল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ফিরিঙ্গী সাহেব তাতে আরও চটে যান। ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য সাহেবকে দুঃখপ্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু ফিরিঙ্গী সাহেব তাতে তো রাজী হনই না, বরং পুনরায় একই মন্তব্য প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্র এবার আর কোনও অনুরোধ না করে দৃঢ়ভাবে ঐ ফিরিঙ্গী সাহেবকে তাঁর ভাষাতেই অভিনন্দিত করেন। সাহেব তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এভাবে দু'জনের মধ্যে তীব্র বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয়। এবং শেষ অবধি তা হাতাহাতিতে গড়ায়।

শরৎচন্দ্র বুঝলেন আত্মসম্মান নিয়ে ঐ অফিসে তাঁর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া অফিসের অবাঞ্ছিত পরিবেশ তাঁকে বহুদিন থেকেই পীড়িত করছিল। তিনি নিজের টেবিলে ফিরে আসেন। এবং একটুকরো কাগজ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। পদত্যাগের ঐ তারিখটা ছিল ৩রা এপ্রিল ১৯১৬ সাল।

ঐ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনস্থ বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন: অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসের ছোট সাহেবের সহিত সামান্য কারণে ঘুষাঘুষি করিয়া তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

শারীরিক অকুশলতার জন্য ডাক্তাররা আগেই শরৎচন্দ্রকে রেঙ্গুন তথা ব্রহ্মদেশ ছাড়তে বলেছিলেন। অথচ ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে কোথায় যেন তাঁর একটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু অফিসের ঐ ঘটনার অবাঞ্ছিত স্রোত এবার অভিমানী শরৎচন্দ্রকে চঞ্চল করে তুললো, তাঁর মা আর এক মুহূর্তও ঐ দেশে থাকতে চাইল না। তিনি রেঙ্গুন ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। অফিসের কাজে ইস্তফা দেওয়ার মাত্র সাতদিনের মাথায়, অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল, কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন।

ব্রহ্মদেশের সাধারণ মানুষের জন্য শরৎচন্দ্রের বেশ দরদ ছিল।

একটানা প্রায় চৌদ্দ বছর সেখানে থেকে তিনি দেখেছেন: নারী-স্বাধীনতার দেশ বর্মায় পুরুষেরা কর্মবিমুখ, অলস প্রকৃতির। মেয়েরাই গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে ব্যস্ত থাকেন, পরিশ্রম করেন। এর ফলে বাইরের লোক গিয়ে ঐ দেশের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়—অর্থ উপার্জন করে। এভাবে ব্রহ্মদেশের সমাজজীবনের যে ক্ষতি হচ্ছিল, তা তিনি অনুভব করতেন। ব্রহ্মদেশে থাকাকালে তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে প্রায়ই বলতেন: এ দেশটা হলো এদের (বর্মাদের)। পয়সা নিয়ে যাচ্ছি আমরা। শুধু পয়সাও নয়, সামনের ভাতও জোর করে নিয়ে যাচ্ছি। এ জাতটা এত অলস যে খেটে খেতে চায় না। জাতটাকে দেখে প্রাণে বড় মায়া লাগে। এরা যেদিন অন্নাভাবে হাহাকার করবে, যেদিন নিজেদের অবস্থার কথা ভালভাবে বুঝতে শিখবে, সেদিন এদের উন্নতি হবে।...

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ ছেড়ে এসে পরবর্তী জীবনেও তার কথা ভুলতে পারেননি। সেখানকার সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত। বন্ধুবান্ধব এবং নানা আলোচনা সভায় রেঙ্গুন, তথা ব্রহ্মদেশের সমাজজীবনের বিচিত্র কাহিনী প্রায়ই তিনি বর্ণনা করতেন। ব্রহ্মদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদী মনের পরিচয় পেয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

পল্লীজীবন : আতিথেয়তা

শহর জীবনের কৃত্রিম আবহাওয়ার চেয়ে গ্রাম-বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ শরৎচন্দ্রকে অনেক বেশি আকর্ষণ করত। তাছাড়া গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও পল্লীসমাজ সম্পর্কেও তাঁর প্রচুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল। তাই ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হাওড়ার বাজেশিবপুর ছেড়ে হুগলী জেলার রূপনারায়ণের তীরে চলে যান।

আগে থেকেই দিদির বাড়ি হুগলী জেলার গোবিন্দপুরে তাঁর যাতায়াত ছিল। সেই সুবাদে ঐ গ্রাম তো বটেই, আশেপাশের পাঁচ গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। ঐ গোবিন্দপুরের কাছে সামতাবেড়ে অঞ্চলে কিছু ভালো জমির তিনি সন্ধান পান। তাঁর সাধ হলো: রূপনারায়ণের তীরে সবুজঘেরা ঐ গ্রামে তিনি একটি সুন্দর বাড়ি করবেন। তার লাগোয়া যেমন গোয়ালঘর-পুকুর, ফুল-ফলের বাগিচা থাকবে, তেমনি থাকবে ধানের ক্ষেত। সারা বছর সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করবেন। ঐ আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি সামতাবেড়ের সেই জমি কিনতে মনস্থ করেন।

ঐ প্রসঙ্গে তাঁর একটি চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। ২১শে চৈত্র, ১৩২৫ তারিখে তিনি তাঁর এক প্রকাশক-বন্ধুকে লেখেন:...অনেকদিন ধরে রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা মাটির বাড়ি করবার চেষ্টা করছি। খবর পেলাম আজই গেলে যা হোক একটা কিছু হয়। জমিটার দাম ১১০০ টাকা। এত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বার করতে ভারি মায়া হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ি করবার খরচটাও বেশি থাকবে না। আপনার কাছে নিবেদন যে, সেদিনের টাকা থেকে নিজের ৭০০ টাকা দিই। আর আপনি যদি ধার দেন ৪০০ টাকা তাহলে সুন্দর সুবিধে হয়।

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র তাঁর পছন্দমত ঐ জায়গা কেনেন। এবং মনের মতো করে মাটির একটি দোতলা বাড়ি তৈরী করেন। বাড়িটি এমনভাবে তৈরী করানো হয় যাতে তার দোতলার বারান্দায় বসে রূপনারায়ণের রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। আর দোতলা বাড়িটি তৈরিও হয়েছিল অনেকটা বর্মীজ ঢঙে। মাটির তৈরি ঐ বাড়িটির চারপাশে ঢাকা বারান্দা ছিল। আর তার মেঝে এবং বারান্দা সিমেণ্ট দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধানো ছিল। বিশেষ ঢঙের ঐ বাড়ি দেখে অনেকেই মনে করতেন, কথাশিল্পী ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলে এসে সেই দেশের স্মৃতি তখনও তিনি ভুলতে পারেননি।

মাটির বাড়িটির চারপাশে ফুল এবং ফলের বাগান সকলেরই দৃষ্টি

আকর্ষণ করত। তাছাড়া বাড়ির সামনে বিরাট উঠোন, আর তারই লাগোয়া ছিল গোয়ালঘর। বাড়ির পেছনে দুটি বিরাট পুকুর ছিল। গোয়াল ভরা দুধ, পুকুর ভরা মাছ থাকলেও, তার সঙ্গে যে বছরের খোরাক ধান চাই, সেদিকটাও কথাশিল্পীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাই বাড়ির খুব কাছে তিনি বেশ কিছু ধানের জমিও কিনেছিলেন। সুতরাং তাঁর দুধ-ভাত-মাছের আর কোন অভাব ছিল না। বাড়িটি তিনি ছবির মতো করে সাজিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁর যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও হয়। তাই প্রকাশক-বন্ধুকে পরবর্তীকালে আর এক চিঠিতে লেখেন: এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত বোধকরি হাজার ষোল-সতেরো টাকা নষ্ট করলুম।

নিজের বাড়িতে গিয়ে শরৎচন্দ্র একজন সম্পন্ন গৃহস্থের মতোই সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস শুরু করলেন। অতিথি-অভ্যাগত তাঁর প্রায়ই লেগে থাকত। দূর থেকে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ গেলে তাঁকে না খাইয়ে তিনি ছাড়তেন না। বলতেন: আমার বাড়িতে তো আমি সব কিছুরই ব্যবস্থা করে রেখেছি। খাও দাও, পল্লীর শোভা দেখ, তারপর যাবে। তাঁর অতিথিপরায়ণতার কথা তখনকার দিনে বন্ধুবান্ধবদের কাছে একটি লোভনীয় বিষয় ছিল।

শরৎচন্দ্রের আতিথেয়তা সম্বন্ধে 'অমৃতচক্রের' তদানীন্তন সম্পাদক উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

একদিন বেলা প্রায় একটার সময় শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িতে গিয়া পৌঁছিলাম। শরৎচন্দ্র তখন আহারান্তে একখানি ইজিচেয়ারে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন চৈত্রমাস—দ্বিপ্রহরে যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া এত যত্ন করিলেন যে, আমি মনে করিলাম যেন কোন অতি আত্মীয়ের নিকট আসিয়াছি··· কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তিনি কত বড়, আমার মতো একজন সামান্য ব্যক্তিকেও যিনি এত সমাদর করিলেন। এমনি অতিথিপরায়ণ ছিলেন শরৎচন্দ্র—এতই মিষ্টি ছিল তাঁহার ব্যবহার।···(বিচিত্রা মাঘ, ১৩৪৪)

এখানে উল্লেখ্য উমাচরণবাবুকে শরৎচন্দ্র আগে চিনতেন না এবং তাঁর সঙ্গে কোন পরিচয়ও ছিল না। তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন একটি সভায় সভাপতিত্ব করার অনুরোধ নিয়ে। শরৎচন্দ্র সে অনুরোধ রাখতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতিথিকে যেভাবে আপ্যায়ন করেন—তা অভাবনীয়।

শরৎচন্দ্রের অতিথি ছিলেন দুই শ্রেণীর। দিনদুপুরে যারা আসতে থাকতেন, তাদের তো প্রায় সকলেই দেখতেন, চিনতেন। ঐ শ্রেণীর অতিথি ছাড়া আর যাঁরা আসতেন, তাঁরা থাকতেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। রাতের অন্ধকারে আসা সেই বন্ধুবান্ধবরা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতা। স্বদেশসেবী ঐসব বিপ্লবীরা ছদ্মবেশে আসতেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের লোক সক্রিয় থাকত—সারাদিনে বিপ্লবীরা হয়তো উপবাসী থাকতে বাধ্য হতেন। কাছাকাছি অঞ্চলের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা তাই প্রায়ই রূপনারায়ণের বুকে ডিঙি ভাসিয়ে গভীর নিশীথে কথাশিল্পীর বাড়িতে এসে উঠতেন। তারপর গোপনে সলাপরামর্শ করে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার নিরুদ্দেশ হতেন। শরৎচন্দ্র ঐসব দেশকর্মীদের নগদ অর্থও সাহায্য করতেন। ঐ কাজটা এত স্বাভাবিক এবং সুন্দরভাবে চলতো যে ইংরেজ সরকারের পুলিশ কোনদিনই তা ধরতে পারেনি।

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু বিপ্লবীদের ঐভাবে সাহায্য করায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা অনেক সময় প্রশ্ন তুলেছেন: কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নির্দেশ অনুযায়ী অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী হয়েও, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ রাখেন কেন?

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলতেন: সন্ত্রাসমূলক আন্দোলনকে আমি বিশ্বাস করি না সত্য, তবুও ঐ বিপ্লবীদের ওপর আমার সহানুভূতি আছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে যে-পথেই কাজ করুক না কেন, আমি তাঁদের সকলকেই শ্রদ্ধা করি। সেজন্যই আমি এঁদের

খোঁজ-খবরও রাখি এবং নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্য করে থাকি।

শরৎচন্দ্রের পল্লীবাস এবং সামতাবেড়ে অঞ্চলে নদীর তীরে ঐভাবে বাড়ি করার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার কোন সম্পর্ক আছে বলে অনেকেই মনে করেন। কেননা, তখনকার দিনে আত্ম-গোপনকারী রাজনৈতিক কর্মীদের এক গোপন আশ্রয়স্থল ছিল শরৎচন্দ্রের ঐ পল্লীভবন।

সারা ভারতে সেবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। গান্ধীজির নেতৃত্বে ঐ আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সর্বাত্মক ঐ আন্দোলনে ভীতসন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার তখন কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি কংগ্রেসের ওপর বিদেশী শাসকের ঐ আক্রমণের তাৎপর্য ভালভাবেই বুঝলেন। কারোর কাছেই আর অস্পষ্ট থাকল না যে, কংগ্রেস-কর্মীদের ওপর নির্যাতন শুরু করার জন্য ইংরেজ সরকার সক্রিয়। তাই কংগ্রেসের প্রথমশ্রেণীর সক্রিয় সদস্যরা আত্মগোপন করে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন। শরৎচন্দ্র সেই চরম মুহূর্তে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পল্লীভবনে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার গোপন ব্যবস্থা করলেন। ঐ সময় শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু মনীন্দ্রনাথ রায়কে একটি চিঠিতে লেখেন : ···লোকের আসার বিরাম নাই—দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বে-আইনী হবার দরুণ যাঁরা অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের। ··

সামতাবেড়ের ঐ পল্লীভবনে বসে শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের কীভাবে সাহায্য করতেন একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রেপ্তারী পরওয়ানা থাকায় বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সামতা-বেড়ের অদূরে তখন এক কৃষকের ঘরে আত্মগোপন করে থাকেন। ঐ বাড়িতে বসে বিশেষ দূতের মারফৎ তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতেন। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তিনি উঠতে ভরসা পান না, পাছে পুলিশের লোক তাঁকে ধরে ফেলে। একদিন এক দূত মারফৎ

বিপিনবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে গোপন বার্তা পাঠালেন: ঠিক দুপুরে আলুওয়ালার বেশে তিনি তাঁর বাড়ি যাবেন। এবং ঐ সময় তাঁদের মধ্যে কিছু জরুরী কথাবার্তার বিনিময় হবে।

শরৎচন্দ্র দুপুরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'আলু চাই', 'আলু চাই' হাঁক দিতে দিতে বিপিনবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ির সামনে এলে শরৎবাবু আলুওয়ালাকে ভেতরে ডাকলেন। স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী তো অবাক। বললেন: ঘর ভর্তি আলু, তবু আবার আলু কেনার সখ কেন?

শরৎবাবু বললেন: দেখো, বেচারি এই ভরদুপুরে কী কষ্ট করেই না আলু ফিরি করছে। নাও না, কিছু আলু রেখে দাও। ওর পরিশ্রম অন্ততঃ কিছুটা পোষাবে।

হিরন্ময়ীদেবী আলু কিনলেন। এমন সময় শরৎবাবু আলু-ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন: ওহে, দুপুর তো হয়ে গেল। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

: না বাবু, রাত্রে বাড়ি ফিরে খাব। এই আলু বিক্রী করে তবে তো বাড়ি ফিরব। ছদ্মবেশী আলুওয়ালা জবাব দিল।

শরৎচন্দ্র বললেন: তা বামুনের বাড়িতে এই দুপুরে এসে দুটো না খেয়ে যাবে—তা কি হয়? দুটো ভাত এখানেই খেয়ে যাও।

আলুওয়ালা খুব খুশীর ভাব প্রকাশ করল। হিরন্ময়ী দেবী অতিথির আহারের ব্যবস্থা করতে ভেতরে গেলেন। সেই সুযোগে বিপ্লবী বিপিনবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিলেন। এবং আলুর দামের নাম করে শরৎচন্দ্র মোটা অঙ্কের বেশ কিছু টাকাও তাঁর হাতে দিয়ে দিলেন। বলাবাহুল্য, বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্যই তাঁর ঐ অর্থদান।

সামতাবেড়ে অঞ্চলে বাস করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন, সেখানে মেয়েদের কোন শিক্ষাব্যবস্থা নেই। পল্লীগ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষায় বড় করে তুলতে না পারলে যে সমাজের বা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অসম্ভব, তা তিনি বিশ্বাস করতেন। আর মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করতেন বলেই সামতাবেড়ে অঞ্চলে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন।

গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। শিশুর মতো তিনি বিকেলে গিয়ে ছেলেদের খেলার মাঠের সামনে বসে থাকতেন। আর তাদের নানাভাবে উৎসাহ জোগাতেন। সেই উৎসাহ শুধু মৌখিকভাবেই জোগাতেন না। কোনদিন তাদের জন্য ছোলা ভাজা নিয়ে যেতেন, আবার কোনওদিন-বা বিস্কুট বিলি করতেন খেলোয়াড় ছেলেদের মধ্যে। তারপর মাঠে বসেই তাদের সঙ্গে নানা ধরনের গল্পসল্প করতেন—ব্যক্তিগত-ভাবে সকলের খোঁজখবর করতেন।

শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা জানতেন। তাই খেলাধুলায় কেউ কোন আঘাত পেলে তাদের ওষুধ দিতেন। এক কথায় বলা চলে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতার কাছে তাদের সঙ্গীরূপে পরিচিত ছিলেন। এবং সেই কারণেই বোধকরি প্রায় সকলের ঘরের খবর জানতেন। কার মেয়ের বিয়ে দিতে অসুবিধা, টাকার অভাবে কার ঘরে কোন্ রোগীর ওষুধ-পথ্য দিতে কষ্ট হচ্ছে, এসব খবর ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি নিজে গ্রামের লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেনই, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের পথ্যও জোগাড় করে দিতেন। তিনি কারোর অপেক্ষায় থাকতেন না। অসুস্থ হওয়ার কোন খবর পেলে তিনি ওষুধের বাক্স নিয়ে নিজেই ছুটতেন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির কিছু অংশ থেকেই বোঝা যাবে—চিকিৎসক হিসাবে শরৎচন্দ্রের কী রকম দরদী মন ছিল। তিনি লেখেন : ...এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা করে এলাম। সর্বাঙ্গে 'টিনচার আয়োডিন্' মাখিয়ে 'আরনিকা' খাবার ব্যবস্থা করে, তাপ-সেঁকের বন্দোবস্ত করে দিয়ে ফিরছি। কাল রাত্রে তার নৌকো ডুবে, তার উপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।...

সামতাবেড়ে এবং তার আশেপাশের গ্রামের দুঃস্থ ও দরিদ্রদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। ঐ প্রসঙ্গে তদানীন্তন 'ভারতবর্ষ'-র সম্পাদক জলধর সেন লিখেছেন : ...সেদিন রবিবার। আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরতের বাসায় যেতাম। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আটটা-নটায় বাড়ি ফিরে আসতাম।

সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ধুতি-শাড়ি ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে। শরৎ একখানি চেয়ারে বসে সুমুখের টেবিলে আনি-দু-আনি, সিকি গুণে গুণে গোছাচ্ছে। আমাকে দেখেই বললেন—দাদা, আমি এই দশটার গাড়িতে দিদির বাড়ি যাবো। তা বলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন রাত সেই দশটায়।

আমি বললাম, দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছো; আর কাঙালী বিদায়ের জন্য ঐ আনি-দু-আনি?

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বলল—না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়। এই বলেই সে চুপ করল। আসল কথাটা গোপন করাই তার ইচ্ছা।

আমি বললাম—ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নতুন কাপড়ই-বা নিয়ে যাচ্ছো কেন? অত সিকি-দুয়ানিরই-বা কী দরকার?

শরৎ অতি মলিন মুখে বলল—দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার

চারপাশের গাঁয়ের গরীব-দুঃখীদের যে কী দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কি…

শরৎ আর বলতে পারল না। তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।…

শুধু নিজের গ্রামের বা অঞ্চলেরই নয়। শরৎচন্দ্রের দরদী মন যে-কোন অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে মুখর হতো। এবং তার প্রতিবিধান করার জন্য প্রয়োজনবোধে তিনি নিজের কাঁধে তার দায়দায়িত্ব তুলে নিতেন। দুঃস্থ মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

কাশী বেড়াতে গিয়ে সেবার জনৈক প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ হয়। প্রতুলবাবু সেখানেই কাজ করতেন। তিনি দুর্গাদেবী নামে জনৈকা বিধবাকে বিবাহ করেন। ঐ বিবাহের ব্যবস্থা হয় হিন্দু মিশনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রতুলবাবুর আত্মীয়রা ঐ বিবাহ মেনে নিতে এবং নববধূকে গ্রহণ করতে রাজী হন না।

প্রতুলবাবু তখন শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর পরামর্শ চান ও সাহায্য-প্রার্থী হন। কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র নিজের মেয়ের মতো দুর্গাদেবীকে সামতাবেড়ের বাড়িতে বেশ কিছু দিনের জন্য আশ্রয় দেন। এবং ঐ সময় দুর্গাদেবীকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেন।

শরৎচন্দ্র ঐ বিবাহ প্রসঙ্গে হিন্দু মিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দকে একটি চিঠি দিলে স্বামীজি শরৎচন্দ্রকে লেখেন: …আপনি মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং কন্যার মতো কাছে রাখিয়াছেন জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বিবাহ আমাদের এখানে হইয়াছে। আইনসঙ্গত প্রমাণ প্রয়োগ সমুদয় রাখা আছে। এবং আমাদের সাহায্য যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই পাইতে পারিবেন।…

অসহায়া বিধবার উপর সমাজের যে লাঞ্ছনা তার প্রতিকারের জন্য শরৎচন্দ্র কিভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন উপরের ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট। বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের মধ্যস্থতায় প্রতুলবাবুর আত্মীয়স্বজন ঐ বিবাহ মেনে নেন।

গ্রামে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজের এবং গ্রামবাসীর নিরাপত্তার জন্য একটি রিভলবার এবং একটি দোনালা বন্দুকের লাইসেন্স করেন। তিনি ঐ দুটি আগ্নেয়াস্ত্র রাখতেন চোর-ডাকাতের হাত থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য। তবে যখনই তিনি রাত-বিরাতে একাকী কোথাও যেতেন, নিজের কোমরে রিভলবারটি রাখতেন—যাতে যে-কোন বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা চলে।

সেবার গভীর রাত্রে তিনি গোবিন্দপুরে দিদির বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। অন্ধকার রাত্রে বেশ দূর থেকে কিছু লোকের জটলা, আর হ্যারিকেনের ছড়াছড়ি দেখে তাঁর ভারি কৌতূহল হয়। তিনি তখন ঐ ভীড়ের মধ্যে গিয়ে হাজির হলে সকলে তাঁকে ঘিরে ধরে এবং বলে : ঐ দেখুন, গাছের গোড়ায় কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে বিরাট এক গোখরো সাপ।

বিরাট বিষধর সাপ দেখে প্রথমে তিনি নিজেও খানিকটা বিব্রত হলেন। তারপর সকলকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে অনুরোধ করলেন। গ্রামবাসী অবাক। তারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এবার সকলকে বিস্মিত করে তিনি তাঁর কোমর থেকে রিভলবারটি খুললেন এবং পর পর কয়েকটি গুলি ছুঁড়লেন। গুলির ঘায়ে সাপটির মৃত্যু হল। তখন সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। ঐদিনই প্রথম শরৎচন্দ্রের রিভলবারটির খবর গ্রামবাসী জানতে পারল।

গ্রামবাসীর নিরাপত্তার জন্য শরৎচন্দ্র যে রিভলবারটি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার তা কেড়ে নিয়েছিলেন। কারণ শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী' প্রকাশের পর ইংরেজ সরকার তা বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। এবং তাঁর কাছে ঐ আগ্নেয়াস্ত্রটি রাখতে আর ভরসা পান না। অবশেষে একদিন পুলিশ পাঠিয়ে রিভলবারটি কেড়ে নেওয়া হয়।

মিথ্যা মামলা : গ্রাম্য রাজনীতি

রূপনারায়ণের রূপসৌন্দর্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে যেমন মুগ্ধ করত, তার ভয়ংকর রূপও তেমনি তাঁকে বিচলিত করত। তিনি তাঁর সাধের বাড়ির দোতলার বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে গড়গড়ায় তামাক খেতেন আর উদাস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন রূপনারায়ণের দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ঐ ভাবে কাটিয়ে দিতেন। নদীর জলরাশি, স্রোতের গতিপ্রকৃতি, পালতোলা নৌকা আর ডিঙি নিয়ে মাঝিদের আনা-গোনা, গাঙচিলেদের কলকাকলি, সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের রঙীন আবেশ—সব মিলিয়ে তাঁর কাছে যেন স্বর্গের সৌন্দর্য নেমে আসত।

আবার বর্ষায় ঐ রূপনারায়ণের ভয়ংকর রূপও তাঁকে উতলা করে তুলত। বন্যা এবং প্লাবনে রূপনারায়ণের উপচে-পড়া জল যখন তার দুই পার প্লাবিত করত—তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। দরদী এবং স্রষ্টা শিল্পীর চোখে তখন সম্ভাব্য বিপদের ভয়ংকর এক ছবি ফুটে উঠত। মাঠের ধান, বাগানের ফল, নীচু জমির মানুষগুলোর দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি অশান্ত হয়ে উঠতেন। রূপনারায়ণের জল যখন তাঁর উঁচু বাড়ির উঠোনে এসে আছড়ে পড়ত, তখন তিনি বেশ বুঝতে পারতেন গাঁয়ের আর পাঁচজনের দুরাবস্থার কথা। রূপনারায়ণের রূপ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : ···এবাড়ি রূপনারায়ণকে উৎসর্গ করে বেঁচেছি। বান ও বন্যায় ঐ নদী যে কী ভীষণ হতে পারে, এবারে ভাল করে দেখলাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আসতে, সে নেই। বোধহয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপর জল আর জল। বাংলাদেশের ষড়-ঋতুর অর্থ যে সত্যসত্যই কি বস্তু, তা এখানে বছরখানেক না থাকলে বোধ করি জানাই যায় না।···

বর্ষা-বাদল-বন্যায় রূপনারায়ণ যখন উত্তাল, বাঁধের পর বাঁধ ভেঙে তার নোনা জল যখন গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দিত শরৎচন্দ্র তখন ঝাঁপিয়ে পড়তেন কর্তব্যের ডাকে। তখন তাঁর চিন্তা আর ভাবনা : কী করে গ্রামের মানুষকে বাঁচাবেন, কী করে মাঠের ধান রক্ষা করে গ্রামবাসীর বিপর্যয় বন্ধ করবেন। তাই তিনি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যেতেন নদীর ভাঙা বাঁধ জোড়া দিতে, কোদাল হাতে মাটি কাটতে। এমনি এক কর্তব্যরত পরিস্থিতিতে ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৩ সালে তিনি উমাপ্রসাদবাবুকে লিখেছিলেন : ...দিন দশ পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মাটি দেওয়া, আর ওখানে গর্ত বোজানো এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে।

পাশের গ্রাম গোবিন্দপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের দিদির বাড়ি। সেখানে বসে এক রাত্রে তিনি গল্প-স্বল্প করছিলেন। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। এর মধ্যেই খবর এল, রূপনারায়ণের জলের চাপে গোবিন্দপুরের মাঠের বাঁধ ভেঙে গেছে। প্রবল বেগে নদীর নোনা জল গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। ধানের মাঠ ইতিমধ্যেই ভেসে গেছে। খবর শোনামাত্র শরৎচন্দ্র অস্থির-চঞ্চল। তিনি এক আশ্চর্য জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বগতোক্তি করে উঠলেন : সর্বনাশ, বাঁধ ভেঙেছে কীভাবে? ধানের ক্ষেতে এভাবে জল ঢুকলে গ্রামের লোক যে না খেয়ে মরবে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পাশেই ছিলেন পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় ওড়ফুলি বিদ্যালয়ের তিনি প্রধান শিক্ষক এবং বিশিষ্ট কর্মী। শরৎচন্দ্র তাকে বললেন : চলো, ঐ ভাঙা বাঁধ জোড়া দিতেই হবে।

সেটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, ঘুটঘুটে অন্ধকার। বন্যা বৃষ্টি আর প্লাবনের জল, সব মিলিয়ে এক অভাবনীয় অবস্থা। শরৎচন্দ্র একজনকে ডেকে বললেন : যাও, আমার বাড়ি গিয়ে 'হ্যাজাক লাইটটা' জলদি করে নিয়ে এস। তারপর হ্যাজাকের আলোয় শরৎচন্দ্র সদলবলে

এগিয়ে চললেন। কারোর হাতে কোদাল ও কাটারি, কারোর হাতে বা ঝোড়া। তাঁদের সঙ্গে কর্মী শরৎচন্দ্র মাটি কাটতে শুরু করলেন। এবং বাঁশ পুতে মাটি ঢেলে ভাঙা বাঁধ জোড়া দিতে লাগলেন। বন্যার জল রোধে শরৎচন্দ্রের সে এক অন্তরূপ।

সমাজসেবা করতে গিয়ে সমাজকর্মী শরৎচন্দ্র একশ্রেণীর গ্রামবাসীর হাতে কম নাজেহালও হননি। ঐ বাঁধ ভাঙা নিয়েই একবার শরৎচন্দ্রকে নানাভাবে অপদস্ত হতে হয়েছিল। গ্রামের একদল গোড়া সমাজপতি শরৎচন্দ্রের সমাজসেবা অথবা তাঁর জনপ্রিয়তায় অত্যন্ত বিরাগ ছিলেন। তা ছাড়া সমাজপতিদের নানা কুসংস্কার, বিধান অথবা সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে উদারচেতা শরৎচন্দ্র সর্বদাই মুখর ছিলেন। সেই সব কারণে সমাজের একদল গোড়াপণ্ডিত নানাভাবে তাঁকে অসম্মান করার চক্রান্ত করেন। কিন্তু বেপরোয়া শরৎচন্দ্র কিছুতেই তাদের কাছে নতি স্বীকার করেন না। শেষ পর্যন্ত তারা গ্রামের একদল জোতদার ও রক্ষণশীল লোকের সহায়তায় কথাশিল্পীর নামে আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের পর্যন্ত করেন। তাদের অভিযোগ ছিল: রূপনারায়ণের তীরে যে সরকারী বাঁধ আছে, শরৎচন্দ্র তা কেটে দিয়েছেন। এবং এইভাবে শরৎচন্দ্র গ্রামবাসী ক্ষতি করে চলেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐ ধরনের মিথ্যা মামলা এবং মনগড়া অভিযোগের জন্য শরৎচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না। স্বভাবতই ঐ মামলার খবর শুনে তিনি প্রথমে বেশ বিচলিত হলেন। এবং কোনও উপায় না দেখে তিনি বিখ্যাত আইনবিদ বরদাপ্রসন্ন পাইনের শরণাপন্ন হলেন।

শরৎচন্দ্র নিজেও রেঙ্গুনে থাকাকালে কিছুদিন আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। তার ওপর সমস্ত ব্যাপারটাই যে মিথ্যা অভিযোগের উপর ভিত্তি করে একটা ষড়যন্ত্র তা তিনি নিজেও জানতেন। আইনজীবী বন্ধু বরদাবাবুকে ঐ মামলার মিথ্যা অভিযোগ প্রসঙ্গে যেসব তথ্য তিনি তড়িঘড়ি করে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—

(ক) সাবেক বাঁধ সরকার হইতে বাতিল হইবার পরে ইহার অধিকাংশই নদীগত হইয়াছে, স্থানে স্থানে ইহার সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে।

(খ) ...উত্তরদিকে হানা দফাদার শ্রীনিবারণ ঘোষালের সম্পত্তি। এতএব আমি ইচ্ছা করিলেও এই স্থান কাটাইতে পারি না। নিবারণ ঘোষাল মহাশয় তাহাতে আপত্তি করিতেন। তিনি বাদীদের পক্ষভুক্ত না থাকায় ইহা মিথ্যা।

(গ) এই গ্রামের মধ্যে আমার জমি বাদীদের অপেক্ষা বেশী। সুতরাং নদীর জল প্রবেশ করাইয়া কোন প্রকার ক্ষতিকর কার্য করিলে, আমার নিজের ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। সুতরাং এরূপ কার্য আমি কোন মতেই করিতে পারি না।

(ঘ) বাদীদের কতগুলি স্বাক্ষরকারী এ গ্রামের লোক নহে। গ্রামের ক্ষতি বৃদ্ধিতে তাহাদের কোন লাভক্ষতি নাই। এবং কতগুলি লোক একই বাড়ির। সুতরাং দুই একজন লোক বিদ্বেষবশতঃ কতগুলি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া এই আবেদন করিয়াছে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরর্থক কষ্ট দিবার জন্য।

(ঙ) এই বাঁধ পরিত্যক্ত হইবার পরে ৬০।৭০ বৎসর সরকার হইতে ইহার মেরামত হয় নাই। নদীর প্রবল স্রোত ও ঢেউ-এর জন্য অপরাপর স্থানে স্থানে যেমন ভাঙিয়া গিয়াছে, এই দুইস্থানে তেমনি ভাঙিয়াছে। আমার কোন প্রকার অপরাধের জন্য নহে।...

শরৎচন্দ্র যেসব তথ্য উকিলবাবুকে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকেই বেশ বোঝা যায়, স্বার্থান্বেষী একদল গ্রামের মানুষ বিদ্বেষবশতঃ তাঁকে অপদস্থ করার জন্য কতটা সক্রিয় ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁর বিরুদ্ধাচারীরা পরে ঐ মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। কেননা, শেষ পর্যন্ত গ্রামে যে সালিশী বসে, তাতে শরৎচন্দ্র বিজয়ী এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে বিবেচিত হন। যারা মামলা করেছিল, অনেকে তাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার জন্য শরৎচন্দ্রকে পরামর্শ দেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাদের ক্ষমা করেন এবং বলেন : ওরা ওদের

অপরাধী মনে করছে এটাই বড় সাজা—এরপর আর কোন প্রতিশোধের প্রশ্ন ওঠেনা।

পল্লী বাংলায় বসবাস করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে কতটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর লেখা একটি চিঠির কিছু অংশ থেকেই বোঝা যায়। ১৩৩৬ সালের ২৫শে কার্তিক সামতাবেড়ে থেকে তিনি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যাকে লেখেন: ···পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ মামলায় জড়িয়ে—Civil এবং Criminal—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি করছি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়া-গাঁয়ের দেবতার আর সইলো না, ঘাড়ে চাপলেন।···

ঐ চিঠিতে গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যে বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন কথাশিল্পীর সাহিত্য জীবনের নানা চরিত্র অঙ্কনে তাঁকে তা বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু পল্লী জীবনের নানা পর্যায়ে তিনি যেভাবে অপদস্থ হয়েছেন, তাঁর জীবন-চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য যেসব চক্রান্ত হয়েছে, তাতে যে তিনি হতাশ হয়েছিলেন, তাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ঐ হতাশা এবং উদাসীনতাই বোধকরি তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে বাস্তববাদী করে তুলতে সাহায্য করে। এবং সে কারণেই তাঁর সৃষ্ট পল্লীসমাজের বিচিত্র সব চরিত্র আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অত্যন্ত পরিচিত।

অসহ্য পরিবেশ: দৃঢ়তায় অবিচল

১৩৩৬ সালের ২৫শে কার্তিক। শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীভবন সামতা-বেড়ে থেকে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও এক প্রসঙ্গে লিখলেন: ভাবচি, এটা কোন মতে শেষ হলেই পালাবো। সহরই মোটেই ওপর সুসহ।···

শহর ছেড়ে শরৎচন্দ্র গ্রামে গিয়েছিলেন প্রাকৃতিক পরিবেশে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিরুপদ্রব জীবনযাপন করবেন বলে। কিন্তু তাঁর সে আশা পরিপূর্ণ হয়নি। ব্রাহ্মণ হয়ে জেলে-জোলা, চাষা-ভূষার সঙ্গে মেলামেশা, তা গ্রামের গোঁড়া পণ্ডিতেরা মানবেন কেন? তাই তাঁরা শরৎচন্দ্রের চলা-ফেরা আচার-আচরণের ব্যাপারে নানা শর্ত, নানা বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। শরৎচন্দ্রও তখন উদ্ধত। সমাজপতিদের কোনও গোঁড়ামি অথবা কুসংস্কারকে তিনি মোটেই বরদাস্ত করলেন না। বরং উচু-নীচু সকলশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা শুরু করলেন। কারোর বাড়িতে কোন বিপদ হয়েছে শুনলেই তিনি সেখানে ছোটেন। রোগীর ওষুধ দেন, দুঃস্থের পথ্য দেন। তা সে নীচু ঘরের লোকই হোক, আর উঁচু ঘরেরই হোক। তাঁর কাছে কোন জাতের বিচার নেই। মানুষ হলেই হলো। তাঁর এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা খুব স্বাভাবিক কারণেই সেদিনকার সমাজপতিরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তার ওপর ছিল শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক জনপ্রিয়তা। সবাই 'দাদাঠাকুরের' জন্য ভাবে—তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাও শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবনের এক অভিশাপ বলা চলে। সমাজপতিরা এর ফলে তাঁর ওপর দারুণ বিরূপ হন। ঈর্ষা, হিংসা আর পরশ্রীকাতরতার জ্বালায় তাঁরা শরৎ-চন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার শুরু করেন। সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কোন কৌশলই তাঁরা বাদ দেন না। তাই তাঁরা নিত্যনতুন সব মনগড়া গল্প তৈরি করে সুকৌশলে গ্রামের মানুষের মধ্যে অপপ্রচার শুরু করেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য কোনদিনই তার পরোয়া করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন: ...আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি, এ লইয়া বহুবিধ জল্পনাকল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণে প্রচারিত আছে। কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন,

এই সব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে তো সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়—তাদের।...

সামতাবেড়ে বাড়ি করার পর সমাজপতিরা শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার শুরু করলেও শরৎচন্দ্র তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। শরৎচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত তেজী। গ্রামের গোঁড়া পণ্ডিতদের তিনি অমান্য করায় শরৎচন্দ্রকে তাঁরা একঘরে করতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হননি। শরৎচন্দ্র তাতেও দমলেন না। বরং গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর দিনদিন আরও গভীর হতে লাগল। শরৎচন্দ্রের এই দুঃসাহসে বোধকরি সমাজপতিরা একটু নরম হলেন। এবার তাঁরা নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। জনৈক প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁর কাছে প্রস্তাব রাখলেন: স্থানীয় পাণিত্রাস উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের তহবিলে শ'দুয়েক টাকা দান করুন, তা হলে আর আপনাকে এক-ঘরে হয়ে থাকতে হবে না, পণ্ডিতরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেবেন।

প্রস্তাব শুনে শরৎচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। উত্তেজিত হয়ে প্রস্তাবককে হাঁকিয়ে দিয়ে বললেন: বিদ্যালয়ের জন্য দুশো কেন, দু' হাজার টাকা দিতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু টাকা আদায়ের জন্য আপনাদের যে সর্ত এবং মতলব রয়েছে, তার জন্যই আমি একটি পয়সাও দেবো না। কোন সৎ উদ্যোগের সঙ্গে বিশেষ কোন সর্ত বা মতলব রাখা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি। যখন—একঘরে হয়ে আছি, আমি তাই থাকবো।...

শরৎচন্দ্রের ঐ জবাব পেয়ে সমাজপতিরা বেশ অপমান বোধ করলেন। গ্রামের রক্ষক হয়েও তাঁরা শরৎচন্দ্রকে যখন ঐ পথে কাহিল করতে পারলেন না, নিজেদের অক্ষমতার জন্য নিজেরাই তখন লজ্জা বোধ করলেন। বুঝলেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের কৌশলটা বেশ ধরে ফেলেছেন। তাই অন্য পথে তাঁকে জব্দ করার জন্য নতুন করে সলাপরামর্শ আর কৌশল করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরের কথা।

পাশের গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ জনৈক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মা মারা গেলেন। সমাজপতিরা মাতৃদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আশুতোষ-বাবুকে ডেকে বিধান দিলেন: তোমার অবস্থা যখন ভালো, পাঁচ গাঁয়ের সকল ব্রাহ্মণ পরিবারকে তুমি মাতৃশ্রাদ্ধের আসরে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের সেবাযত্ন করো। তাতে তোমার মায়ের আত্মা শান্তি পাবে। সমাজপতিদের বিধান পেয়ে আশুতোষবাবু তা মেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতিরা আবার নির্দেশ জুড়ে দিলেন: সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে নিমন্ত্রণ করার সময় তুমি নিজে শরৎবাবুর বাড়িতেও যেও। তাঁকে বলো: সমাজপতিরাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে বলেছেন। তাঁরা আর আপনাকে 'একঘরে' করে রাখতে চান না। অতএব অনুগ্রহ করে ঐদিন আপনি সপরিবারে এসে আমাকে মাতৃদায় থেকে উদ্ধার করবেন।

মাতৃদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ খুব স্বাভাবিকভাবে সবিনয়ে শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানান। সমাজপতিদের নির্দেশমতই শরৎচন্দ্রকে যে ঐ কথাগুলি বলা হয়েছে তা জেনে সমাজপতিরা বেশ উৎসাহী এবং উৎফুল্ল হলেন। তারপরই তাঁরা আবার গোপনে আলোচনায় বসলেন। কৌশল করলেন, নিমন্ত্রণ খেতে এলে পংক্তি ভোজে বসিয়ে অপমানিত করে কীভাবে তাঁরা শরৎচন্দ্রকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেবেন। আর যদি নিমন্ত্রণরক্ষা করতে না আসেন? তহলেও অসুবিধা নেই। পাঁচ গাঁয়ের ব্রাহ্মণদের কাছে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অভিযোগে জানানো যাবে—ব্রাহ্মণের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজকেই অপমানিত করছেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে আরও জোরদার সামাজিক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে।

দ্রষ্টা শরৎচন্দ্র বোধ হয় তাঁদের চরিত্রগুলি জানতেন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটাই যেন তাঁর জানা ছিল। তিনি ঐ দিন নিজে ঐ নিমন্ত্রণ বাড়ি তো গেলেনই না, এমনকি স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী বা অন্য কাউকে পর্যন্ত সেখানে পাঠালেন না।

শরৎচন্দ্র এইভাবে একজন ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় ব্রাহ্মণদের ভোজ সভায় ভীষণ হৈ-চৈ শুরু হলো। সমাজপতিরা বললেন: পাঁচ গ্রামের ব্রাহ্মণদেরও এর ফলে অপমানিত করা হয়েছে। এর একটা বিহিত চাই। আবার তাঁরা শরৎচন্দ্রকে নাজেহাল করতে সচেষ্ট হলেন। জোট পাকিয়ে এবপর তারা মিথ্যা সব অভিযোগ নিয়ে আদালতে গেলেন। মামলা দায়ের করলেন। অভিযোগ, সরকারী বাঁধ কেটে দিয়ে শরৎচন্দ্র গ্রামের ফসল নষ্ট করেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রাম্য রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে তিনি বিব্রত, বিচলিত হলেন। তবু সমাজপতিদের কাছে নতি স্বীকার করলেন না।

জমিদারের চক্রান্ত: প্রতিরোধ

গ্রাম্যজীবনে জোতদার-জমিদারদের অবিচার শরৎচন্দ্রের সংবেদশীল মনকে প্রায়ই বিদ্রোহী করে তুলত। তিনি লক্ষ্য করতেন, গ্রামের দরিদ্র, বিশেষ করে নীচু শ্রেণীর মানুষের ওপর তাঁরা কারণে-অকারণে প্রায় নানাভাবে অবিচার করেন। মূল উদ্দেশ্য তাদের বঞ্চিত করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করা। ঐ ধরনের লাঞ্ছনা আর অবিচারের প্রতিবাদে তিনি সব সময়ই নিপীড়িত আর বঞ্চিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। তাদের রক্ষা করার জন্য যে-কোনও বিপদের ঝুঁকি নিতেও তিনি পিছপা হতেন না।

জনৈক মোহিনীমোহন ঘোষাল সেবার গোবিন্দপুরের জমিদারী কিনে নিলেন। তারপর সেই নতুন জমিদার স্বেচ্ছাচারীর মতো স্থানীয় রাজবংশীদের উপর নানা উৎপাত শুরু করলেন। ঐ রাজবংশী সম্প্রদায় বর্ষাকালে সাধারণতঃ গোবিন্দপুর এবং আশেপাশের খাল-বিল থেকে মাছ ধরে সংসার চালাত। জমিদারী হাতে

নিয়েই মোহিনী ঘোষাল এক ফতোয়া জারী করলেন : বিরামপুর খালের লাগোয়া বিল থেকে কেউ আর মাছ ধরতে পারবে না। ঐ অঞ্চলের দায়-দায়িত্ব তিনি তুলে দিলেন গোবিন্দপুরের গ্রামেরই দুই রাজবংশী কেষ্ট বাগ, আর দুর্লভ মণ্ডলের হাতে।

গ্রামের সাধারণ রাজবংশীরা তাতে ক্ষুব্ধ হল। বংশ পরম্পরায় যে তারা ঐ অঞ্চলে নির্বিবাদে মাছ ধরে এসেছে। তা ছাড়া ঐ জমিটাও ছিল দেবোত্তর সম্পত্তি। সুতরাং জমিদারী কিনলেও ঐ জমির মালিকানা জমিদারের নেই। তারা সবাই মিলে গিয়ে হাজির হলো জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে। অভিযোগ জানিয়ে সবিনয়ে বলল : ঐ জমিতে মাছ ধরে আমরা সংসার চালাতাম। হঠাৎ তা বন্ধ করে আমাদের অসুবিধায় ফেললেন কেন? তাছাড়া ওটা তো জমিদারের খাস ছাড়—শিবোত্তর সম্পত্তি। আপনি জমিদারী নেওয়ার আগে কোন দিনই কোন জমিদার এভাবে মাছ ধরার অধিকার কেড়ে নেয়নি।

জমিদারবাবু তাদের কথার কোন গুরুত্বই দিলেন না। বরং কড়া মেজাজে উত্তর দিলেন : কোন্ জমিদার কি করেছে তা আমি শুনতে চাই না। আর কোন্‌টা দেবোত্তর জমি, অথবা খাস জমি তা-ও আমি জানতে চাই না। জমিদারী আমি কিনেছি। আমি যে নির্দেশ জারী করেছি, তাই বহাল থাকবে। সুতরাং কোনক্রমেই ওখানে তোমাদের মাছ ধরা চলবে না।...

দরিদ্র রাজবংশীরা নিরুপায় হয়ে এবার কেষ্ট বাগ আর দুর্লভ মণ্ডলের কাছে গেল। কেননা, ওরা দুজন যেমন ঐ গ্রামের রাজবংশীদের মোড়ল ছিল, তেমনি আবার জমিদারবাবু ওদের দুজনকেই ঐ জমির দায়-দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা দুই মোড়লকে জমিদারের হয়ে ঐ বে-আইনী কাজের দায়িত্ব না নিতে অনুরোধ জানাল।

দুই মোড়ল কিন্তু তাতে রাজী হলো না। তারা সাময়িক স্বার্থে জমিদারের পক্ষেই কথাবার্তা বলল এবং স্বজাতি রাজবংশীদের আবেদন অগ্রাহ্য করে তাদের বিমুখ করল।

রাজবংশীরা এবার আর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারল না। বাঁচবার অধিকার মনে করে তারা জোটবদ্ধ হলো। স্থির করল, জমিদারের আদেশ তারা মানবে না। আগের মতোই ঐ খাস জমি থেকে মাছ ধরবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা দলবদ্ধভাবে মাছ ধরতে নামল।

জমিদারের দুই প্রতিনিধি দুর্লভ আর কেষ্ট এবার ছুটে গিয়ে তাদের মাছ ধরায় বাধা দিল। এ নিয়ে রাজবংশীদের সঙ্গে তাদের কিছুটা ধ্বস্তাধ্বস্তিও হলো। সেখানে পরাজিত হয়ে তারা ছুটে গেল জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তারা মনগড়া নানা বিবরণ জানাল। জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন: দেখা যাক—জমিদারের হুকুম ওরা কি করে অমান্য করে। বলেই উত্তেজিত জমিদার ঐ দুই দূতকে নিয়ে সরাসরি আদালতে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দুর্লভ আর কেষ্টকে বাদী করে একটি মামলা জুড়ে দিলেন।

কদিন পরের ঘটনা। শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন, জমিদার তাঁর দুই দূতকে সামনে রেখে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। শরৎচন্দ্র জানতেন মামলার কী ঝামেলা। তাছাড়া জমিদারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুঃস্থ গ্রামবাসী মামলা লড়তে পারবে না। তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে গেলেন। সব কথাবার্তার পর অনুরোধ রাখলেন: মামলা-মোকর্দমা তুলে নিন—একটা মীমাংসার সূত্র বার করা যাক। মামলায় দুপক্ষেরই ঝামেলা বাড়ে, ক্ষতি হয়।

জমিদার শরৎচন্দ্রের অনুরোধ তো রাখলেনই না, বরং সদম্ভে বললেন: কারোর উপদেশ আমি শুনতে চাই না। শুনেছি, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে আপনি ওদের সাহায্য করছেন। তা করুনগে। আমি মামলা তুলব না। কী করে গোবিন্দপুরের মানুষকে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি।

জমিদারের ঔদ্ধত্য এবং গরীব প্রজাদের প্রতি তার নির্দয়তায় শরৎচন্দ্রও ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি মূলতঃ উপেক্ষিত হয়ে ফিরে এলেন।

তারপর স্বেচ্ছায় তিনি গ্রামবাসীর সাহায্যে এগিয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ি থেকে ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে কেদার বন্দোপাধ্যায়কে যে চিঠি দেন, তার একটি অংশ উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন : ...বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ দুর্বিসহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান, কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে আমি হাতে নিলে তা ছাড়িনে। তারপরে ফৌজদারী। যাক সে কথা—তবে ঝঞ্ঝাট বেড়েচে। ভাবছি এটা কোনমতে শেষ হলেই পালাবো। সহরই মোটের ওপর সুসহ।...

শরৎচন্দ্র এবার সক্রিয়ভাবে এগিয়ে গেলেন বিপন্নপ্রায় মানুষগুলোকে সাহায্য করতে। এবং সত্যসত্যই তিনি ছাড়লেন না। জমিদারের বিরুদ্ধেও এবার পাল্‌টা আরেকটি মামলা দায়ের করা হলো। জমিদার যে জমির ওপর রাজবংশীদের অধিকার অস্বীকার করেছিলেন, আদালতের নির্দেশে জমিদারও সাময়িকভাবে সেই জমির ওপর কর্তৃত্ব হারালেন। অর্থাৎ ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত জমিদারও ঐ জমিতে নামতে পারবেন না, বা তা থেকে মাছ ধরাতে পারবেন না। গ্রামের লোক এবার মানসিক দিক থেকে আরও জোর পেল। তাদের ঐক্য আরও দৃঢ় হলো। জমিদার বিব্রত, বিচলিত হলেন।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। চৈত্র মাসে গ্রাম-বাংলায় শিবের গাজন হয়। গাজন উপলক্ষে অনেকেই 'সন্ন্যাসী' হয়। জমিদারের দুই দূত দুর্লভ এবং কেষ্টও প্রতি বছরের মতো শিবের গাজন উপলক্ষে 'সন্ন্যাসী' হলো। দুর্লভ এবং কেষ্ট জমিদারের হয়ে গ্রামবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করায় গ্রামের লোক আগে থেকেই ক্ষেপে ছিল। গাজনের মেলার ঠিক আগে গ্রামের লোক এক সভায় মিলে সিদ্ধান্ত নিল : জমিদারের এ দুই প্রতিনিধিকে শিবের গাজনে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। এবং

এভাবেই তারা ঐ দুজনকে গোবিন্দপুরের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

ঐ সিদ্ধান্তের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দুর্লভ মণ্ডল আর কেষ্ট বাগ সব জানতে পেরে বেশ অসহায় বোধ করল। তারা দুজনে গিয়ে হাজির হলো জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে। সব শুনে জমিদারবাবু বুঝলেন, গ্রামের পাঁচজন ঐ সুযোগে তাঁর বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছে। এবং এটাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো যে, দুর্লভ ও কেষ্টকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ, তাঁর প্রতি গ্রামবাসীর অনাস্থা। তাই জমিদার এবার নতুন খেলায় মাতলেন।

জমিদার মোহিনী ঘোষালের সঙ্গে স্থানীয় মহকুমা শাসক এবং পুলিশের বেশ হৃদ্যতা ছিল। ফলে যখন-তখন প্রভাব খাটিয়ে তাদের দিয়ে যে-কোন কাজ করানো তার পক্ষে খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। তার ওপর নগদ টাকার খেলা তো ছিলই। তাই জমিদারী চালে মোহিনীবাবু গ্রামবাসীকে বেশ বেকায়দায় ফেললেন। অর্থাৎ গাজনের মেলায় বড় রকমের একটা বিপদের আশঙ্কা আছে জানিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে দিয়ে তিনি সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করিয়ে দিলেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পথে মোড়ে মোড়ে, শিব-তলার মাঠে প্রচুর পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করলেন। উদ্দেশ্য গাজনের মেলা বন্ধ করা এবং সেই সঙ্গে গ্রামবাসীকে দেখিয়ে দেওয়া, পুলিশ-শাসক সবই তার পক্ষে। সুতরাং সাবধান—।

গ্রামবাসী ভয় পেল সন্দেহ নেই। কিন্তু গাজনের মেলা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সুতরাং ঐ উপলক্ষে পুলিশের উপস্থিতি তাদের ক্ষোভ বাড়াল। তারা স্থির করল—আর যাই হোক, গাজনের মেলায় তারা সকলে জমায়েত হবেই। এবং দুর্লভ ও কেষ্টকেও তারা ঐ মেলায় ঢুকতে দেবে না। তাতে যদি পুলিশ বাধা দেয় দিক—তবু তারা দমবে না। প্রয়োজনে পুলিশকেও প্রতিরোধ করা হবে। অদ্ভুতভাবে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সকলের কাছে গাজনের মেলা এবং পুলিশের ব্যাপারটি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। 'লাঠি-সড়কি

ইত্যাদি নিয়ে তারা তৈরী হতে লাগল। সকলেই বুঝতে পারল, শান্তিভঙ্গের নাম করে পুলিশ আনিয়ে জমিদার তাদের দেখাতে চাইছেন, পুলিশ সাহেব তার হাতের পুতুল। গ্রামের মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেও যখন তাদের কাবু করতে পারেননি, তখন মিথ্যা অজুহাতে পুলিশ আনিয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। তাই তারা আরও ঐক্যবদ্ধ হলো।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ঘটে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। শরৎচন্দ্র সব শুনে তো বিস্মিত। তিনি মহাভাবনায় পড়লেন। জমিদারের উস্কানিতে যে পুলিশও উত্তেজিত হয়ে আছে তা বেশ বুঝতে পারলেন। গ্রামের লোকদের তিনি অনুরোধ করলেন শান্তি বজায় রাখতে এবং উত্তেজনা না বাড়াতে। তারপর কাউকে কিছু না বলেই তিনি ছুটলেন হাওড়ায়—জেলা শাসকের অফিসে।

জেলা শাসক খ্যাতিমান কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে মহাব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অন্য সব কাজ ফেলে তিনি শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে সব শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলার পুলিশ সুপার, অর্থাৎ পুলিশের সবচেয়ে বড় কর্তাকে, তলব করলেন। পুলিশের বড় সাহেব জেলা শাসকের ঘরে শরৎচন্দ্রকে দেখেই বিস্মিত। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য এবং তাঁর উপস্থিতির কারণ জেলা শাসক পুলিশ অফিসারকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন। জেলা শাসকের বক্তব্য এবং নির্দেশ হলো: শরৎবাবুর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন বলছেন জমিদারের উস্কানিতে ঐ গ্রামে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, এবং জমিদারের ব্যক্তি-স্বার্থে পুলিশের প্রভাব খাটানো হচ্ছে, তখন ওখান থেকে অবিলম্বে পুলিশ তুলে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই শরৎবাবুর হাতে হাতে একটি নির্দেশনামা দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। শরৎচন্দ্র নিজে উপস্থিত থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গাজনের মেলা সম্পন্ন করাবেন।

জেলা শাসকের নির্দেশমত পুলিশ সুপার শরৎচন্দ্রের হাতে একটি জরুরী বার্তা দিলেন। তাতে লেখা হলো: শরৎচন্দ্রই গাজনের মেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অবিলম্বে পুলিশ তুলে নেওয়া হোক।

জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জানিয়ে শরৎচন্দ্র বাড়ির পথে রওনা হতে গিয়ে ট্রেনে উঠলেন। দেখেন ঐ গাড়িতেই বসে সশস্ত্র এস. ডি. পি.ও অর্থাৎ মহকুমা পুলিশ অফিসার। নাম তাঁর ভুবনেশ্বরবাবু। পরিচয় প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন ভুবনেশ্বরবাবু গোবিন্দপুর গ্রামে যাচ্ছেন আরও কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে, সেখানে নাকি খুবই উত্তেজনা। স্থানীয় পুলিশের অফিসার এবং পুলিশকে আক্রমণ করার জন্য নাকি গ্রামবাসী তৈরী হয়ে আছে। ওখানকার অফিসার খবর পাঠিয়েছেন আরও পুলিশ পাঠানোর জন্য। তাই নিজেই যাচ্ছেন গ্রামবাসীর ঐ আক্রমণ বন্ধ করে তাদের সমুচিত শাস্তি দিতে।

যে পুলিশ অফিসার কড়া মেজাজে শরৎবাবুর কাছে ঘটনাগুলি বলছিলেন, তিনি এতক্ষণ শরৎচন্দ্রের পরিচয় জানতেন না। গাড়ির কামরায় বসা কে একজন যাত্রী তাঁকে জানালেন যে যাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন, তিনিই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। পুলিশ অফিসার এবার আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন—তারপরই সবিনয়ে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। পুলিশ অফিসার ভুবনেশ্বরবাবু শরৎচন্দ্রকে চাক্ষুস না চিনলেও তিনি ছিলেন তাঁর একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে কাছে পেয়ে তিনি কৃতার্থ হলেন। বললেন: কী ব্যাপার, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি অনুমতি করুন।

শরৎচন্দ্র একটু হাসলেন। তারপর সবই তিনি খুলে বললেন। গোবিন্দপুরের জমিদার কীভাবে গ্রামের মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগাচ্ছেন, তিনি তা বুঝিয়ে বললেন। তারপর পুলিশ সুপারের লেখা বার্তাটি ভুবনেশ্বরবাবুর হাতে তুলে দিলেন। সব শুনে এবং ঐ বার্তা পেয়ে ভুবনেশ্বরবাবু তো অবাক। সব ব্যাপারটাই তাঁর কাছে এবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

রেলগাড়ি থেকে নেমে এবার ভুবনেশ্বরবাবু আর শরৎবাবুকে ছাড়লেন না। তিনি এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী শরৎচন্দ্রের পেছন

পেছন চললেন। এবং তারা সবাই প্রথমে শরৎচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। সেখানে শরৎচন্দ্র তাদের জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। এবং তারপর শরৎচন্দ্র তাদের সঙ্গে করে গোবিন্দপুরের শিবতলার দিকে রওনা হলেন। শরৎচন্দ্র সকলের আগে। তাঁর পেছনে পেছনে ভুবনেশ্বরবাবু এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী।

দূর থেকে শরৎবাবুকে দেখে জমিদার পক্ষের কে একজন ছুটে গিয়ে দারোগাকে খবর দিলেন, যে শরৎবাবু শিবতলার দিকেই আসছেন। তা শুনে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে দারোগা জবাব দিলেন: তা আসুকগে। দুচারটে বইটই নয় লিখেছে—তার জন্য এখানে এসে যা কিছু তাই করলে চলবে না। তাহলে অপমানিত হয়েই তাকে ফিরতে হবে।

দারোগা সাহেব এবং জমিদারের লোকরা এতক্ষণ বোধকরি জানতে বা বুঝতেই পারেনি যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কারা আসছিলেন। এবার তাদের দেখে দারোগা চমকে উঠলেন। দারোগাবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটু আগেই যে উক্তি প্রকাশ করেছিলেন ভুবনেশ্বরবাবু তাও জানতে পারলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবুকে বললেন: একটু ভদ্রতাও শেখেননি? বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কথা বলা উচিত, সে জ্ঞানটুকুও কি আপনার নেই? জমিদারের কাজ করার জন্য আপনাদের পাঠানো হয়নি। যান, এখান থেকে বেরিয়ে যান—পুলিশ নিয়ে পাশের গ্রামের পানিত্রাস স্কুলে অপেক্ষা করুনগে। আর আমি না আসা পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন।

মহাকুমা পুলিশ অফিসার ভুবনেশ্বরবাবুর তিরস্কার এবং নির্দেশ শুনে দারোগা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তারপর অপরাধীর মতো সব পুলিশ নিয়ে গোবিন্দপুর থেকে সরে গেলেন। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে ঐ দিনই বিকেলে গোবিন্দপুরের শিবতলায় গাজনের মেলা হলো। গ্রাম ভেঙে পড়লো সে মেলায়। শরৎবাবু বললেন: জমিদারদের চক্রান্ত ধরা পড়েছে। দুর্লভ মণ্ডল আর কেষ্ট বাগকে

এবার আর শাস্তি নয়। ওরাও নিশ্চয়ই ওদের ভুল বুঝতে পারবে। ওরা যখন 'সন্ন্যাসী' হয়েছে, ওদের বাসনা মতো এই গাজনে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হোক।

শরৎচন্দ্রের বিধান গ্রামবাসী বিনা দ্বিধায় মেনে নিল। ভুবনেশ্বরবাবুসহ সবাই শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল মেলা দেখে খুশি হলেন। খুশি হলেন শরৎচন্দ্রও। আর যারা বিজয়ের আনন্দে মহাখুশি তারা সাধারণ গ্রামবাসী। তারা সবাই তখন শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্যস্ত। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র যেন তাদের ঘরের মানুষ, গাঁয়ের অভিভাবক, সকলের দাদাঠাকুর।

গাজনের মেলা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হওয়ায় শরৎচন্দ্র যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি নেপথ্যে থেকে যেভাবে জমিদারের চক্রান্ত প্রতিরোধ করলেন, তা জানতে পেরে আশেপাশের পাঁচ গ্রামের মানুষ আশ্চর্য হলেন। সম্ভাব্য একটি সংঘর্ষের হাত থেকে উভয় পক্ষকে রক্ষা করতে পেরে তিনিও নিশ্চিন্ত হলেন।

দিনকয়েক পরের ঘটনা। সামতাবেড়ের নিজের বাড়ির দোতলার বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে শরৎচন্দ্র। নিশ্চিন্ত আরামে তিনি গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। অপলক দৃষ্টি তাঁর রূপনারায়ণের দিকে। এমন সময় এক দম্পতি-যুগল এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

তাঁদের দেখে শরৎচন্দ্র বসতে বললেন এবং পরিচয় জানতে চাইলেন। দম্পতি-যুগল শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করলেন। তারপর ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন: ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছি বলে আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি বাগনান থানার দারোগা। গোবিন্দপুরের গাজনের মেলা নিয়ে সেদিন যে ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে অজ্ঞানতাবশতঃ আপনার প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করে আমি মহা অন্যায় করেছিলাম। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আজ আমি সস্ত্রীক চলে এসেছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।

: আরে ক্ষমার কী আছে? গাজনের দিনে কি বলেছিলে তা

তো আমি ভুলেই গেছি। আর তুমি এমন কী-ইবা বলেছিলে। তা ছাড়া ভুবনেশ্বরবাবুইতো সেদিন তিরস্কার করলেন। আবার কেন তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে? শরৎচন্দ্র বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন দারোগার মুখের দিকে।

অনুতপ্ত দারোগা মাথা নীচু করে বললেন: অফিসারের ধারণা, জমিদারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে আমি সেদিন সঠিক কর্তব্য করিনি—জমিদারের হয়ে কাজ করেছি। তাই তিনি আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। চাকুরি গেলে স্যার আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়ে মরব। তাই আপনিই পারেন আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

দারোগা এবং তাঁর স্ত্রীর কাকুতি-মিনতি বোধকরি দরদী শিল্পীর মনকে আচ্ছন্ন করল। তিনি কাগজকলম নিয়ে ভুবনেশ্বর-বাবুর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে তা দারোগার হাতে দিলেন। বললেন: এটি নিয়ে তুমি অফিসারকে দাও—ভয়ের কিছু নেই।

চিঠিখানি পেয়ে দারোগা দম্পতি প্রণাম জানিয়ে উঠে পড়লেন। শরৎচন্দ্র তাঁদের আবার বসতে বললেন। তারপরই প্রশ্ন: এবার তোমরা নিশ্চিন্ত তো? যাও—অনেক বেলা হয়ে গেছে। এবার স্নান করে দুপুরের খাওয়া সেরে তারপর যাবে। তার আগে আর তোমাদের ছাড়ছি না।

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের বাড়িতেই সেই দুপুরে তাঁরা স্নানাহার সারেন।

পরবর্তী সময়ের কথা।

শরৎচন্দ্রের উদ্যোগে এবং ভুবনেশ্বরবাবুর মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসী এবং জমিদারের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়। গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলাটি জমিদার তুলে নিতে বাধ্য হন। শিবত্তোর সেই জমি আগের মতোই গ্রামবাসীদের ব্যবহারযোগ্য হয়। তার ওপর আর জমিদারের সরাসরি কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

এভাবে দরিদ্র গ্রামবাসী, বিশেষ করে রাজবংশীরা, তাদের বাঁচার লড়াইয়ে জয় হয়। আর ঐ বিজয়ের নেপথ্যনায়ক শরৎচন্দ্রকে তারা আরও আপন, আরও কাছের মানুষ বলে বরণ করে নেয়।

অন্ত মানুষ : অন্ত মন

সেবার শরৎচন্দ্রের এক বন্ধু হাওড়ার জেলাশাসক হয়ে কাজে যোগ দিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর সাহিত্যিকবন্ধু হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া অঞ্চলের কাছাকাছি কোনও এক গ্রামে বাড়ি করে বসবাস করছেন। তাই কাজে যোগ দিয়েই তিনি তাঁর খোঁজ নিলেন।

উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক তার ক'দিনের মধ্যেই জেলা-শাসকের দপ্তরে গেলেন নতুন জেলাশাসকের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর অঞ্চলের কিছু বিবরণ জানাতে। কথা প্রসঙ্গে জেলা-শাসক শরৎচন্দ্রের কথা তোলেন। মহকুমা শাসক জানান, তার এলাকার সামতাবেড়ে গ্রামেই ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বাস করেন। কিছু বলার বা খবর দেওয়ার থাকলে তিনি নিজেই তা পৌঁছে দিতে পারেন।

জেলাশাসকও ঐ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বন্ধু কথা-শিল্পীকে তিনি একখানা চিঠি লিখলেন। তারপর তাঁর হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি তা মহকুমাশাসকের হাতে দিলেন।

চিঠিখানা হাতে পেয়ে মহকুমা শাসক মহাখুশি।. ভাবলেন, কথাশিল্পীর কত বই পড়েছেন। কিন্তু তাঁকে দেখবার অথবা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য তার কোনদিনই হয়নি। এই সুযোগে তিনি কথাশিল্পীর সঙ্গে যেমন পরিচিত হবেন, তেমনি তাঁর নিকট সান্নিধ্যও লাভ করবেন। অভাবিত এই সুযোগটাকে তিনি পরম সৌভাগ্য বলেই মনে করলেন।

পরদিন ভোরেই তিনি সামতাবেড়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে চাপরাসী ছাড়া আর কাউকেই নিলেন না। যে সময়কার ঘটনা, সে সময়টা ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাময়। সারাদেশে তখন বিদেশী সরকারের সঙ্গে চলছে দেশবাসীর অসহযোগিতা। সরকারী অফিসাররাও বসে ছিল না। কংগ্রেসকর্মীদের ওপর তারা কারণে-অকারণে নানা অত্যাচার করছিল। একের পর এক স্বদেশ-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। রাজদ্রোহের মিথ্যা ও মনগড়া অভিযোগ এনে রাজকর্মচারীরা তাদের পদোন্নতির জন্য সক্রিয় ছিল।

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলার কংগ্রেস সভাপতি। জেলার সব সরকারী কর্মচারীর বিশেষ করে অফিসারদের আচার-আচরণ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে গোপনে সব খবরই তিনি রাখতেন। উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক সম্বন্ধেও তাঁর খুব একটা ভালো ধারণা ছিল না। তিনি জানতেন, অন্যায়ভাবে ঐ এলাকার বহু কংগ্রেসকর্মীকে তিনি গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেছেন।

সে যাই হোক—মহকুমা শাসকতো মনের আনন্দে সামতাবেড়ে গ্রামে গিয়ে হাজির। তাকে ঘিরে কৌতূহলী এক বিরাট জনতা। কথাশিল্পীর বাড়িতে তাকে ঢুকতে দেখে উৎসুক গ্রামবাসী বাড়ির চারদিকে দাঁড়িয়ে। মহকুমা শাসক শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ঢুকেই দেখতে পেলেন—তারই অফিসের এক দফাদার জনৈক নিবারণ ঘোষাল সেখানে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই ক্ষুদে ঐ রাজকর্মচারী হাঁক ছাড়লেনঃ নিবারণ, পা ধোয়ার জল নিয়ে এসো। হাতে পায়ে বড্ড ধুলো লেগেছে।

মহকুমা শাসকের ঐ নির্দেশ শরৎচন্দ্রের কানে গেল। লজ্জার জ্বালায় তিনি জ্বলে উঠলেন। নিবারণ ঘোষালের বয়স ছিল মহকুমা শাসকের প্রায় দ্বিগুণ। সে ছিল কথাশিল্পীর প্রতিবেশী। তিনি তাকে খুড়ো বলে সম্বোধন করতেন—সকাল-সন্ধ্যায় একসঙ্গে বসে গল্প-সল্প করতেন। নিবারণ ঘোষাল অভাবের জন্য ছোট কাজ

করলেও শরৎচন্দ্র তাকে যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মান দিতেন। তাই ক্ষুদে সাহেবের নির্দেশবার্তা শুনে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হলেন। ঘরের বাইরে কথাশিল্পী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন। সামনে তিনি মহকুমাশাসককে দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। বললেন: জানেন, ঐ নিবারণ ঘোষালের বয়স আপনার দ্বিগুণ। তাকে আপনি পা ধোয়ার জল আনতে বললেন? আপনি আমার বাড়ি এসেছেন। জল যদি প্রয়োজন তো আমিই এনে দিচ্ছি।

শরৎচন্দ্র বোধকরি আরও কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর উত্তেজিত শরৎচন্দ্র আবার মুখর। বললেন: মশাই, আপনি তো সাহেবী কায়দায় জুতো-মোজা পরেই এসেছেন। ধুলো যা লাগার তা জুতো-মোজার উপরে লেগেছে। বলুন, জল যদি লাগেই, আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

মহকুমা শাসক কোন কথার উত্তর দিতে পারেন না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। চারদিকে গ্রামের অজস্র মানুষ। শরৎচন্দ্র বললেন: রাজকর্মচারী হলে যে মনুষ্যত্বও হারাতে হয়, তা আমি জানতাম না। ভব্যতা-সভ্যতা, সাধারণ ভদ্রতা সৌজন্যবোধও জানা নেই যে এক বৃদ্ধকে পা ধোয়ার জল আনতে বলেন? ঘৃণাভরে শরৎচন্দ্র কথার পর কথার বান ছুঁড়তে লাগলেন। অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে মহকুমা শাসক। কী করবেন, কী বলবেন বুঝতে পারেন না। কাঁপা হাতে তিনি জেলাশাসকের চিঠিখানি কথাশিল্পীর দিকে এগিয়ে দেন। উত্তেজিত কথাশিল্পী চিঠিখানি নিয়ে আর কোন কথা না বলে ঘরের ভেতর চলে যান।

গ্রামবাসী তখনও মহকুমা শাসককে ঘিরে দাঁড়িয়ে। মহকুমা শাসক এবার নীচু মাথায় যে-পথে এসেছিলেন, সে-পথে রওনা হন। সরল সহজ শরৎচন্দ্রের মধ্যে তেজস্বী আরেকটি চরিত্রের সন্ধান পেয়ে গ্রামবাসী বিস্ময়ে হতবাক।

যে যতো ছোট কাজই করুক না কেন, কাজের বিচারে শরৎচন্দ্র

কাউকে ছোট-বড়ো মনে করতেন না। শিক্ষা-অশিক্ষার বিচারেও তিনি কারোর মূল্যায়ন করতেন না। মানুষ হিসাবে তিনি সকলকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। নিবারণ ঘোষালের প্রতি যেমন তাঁর শ্রদ্ধা ছিল—তেমনি তাঁর ভৃত্য-পরিচারকদের জন্যও ছিল তাঁর দরদ ও ভালবাসা।

শরৎচন্দ্রের বাড়িতে কাজ করত ননী। ননী ছিল শরৎচন্দ্রের ভৃত্য। শরৎচন্দ্র কোথাও যেতে-আসতে সাধারণতঃ ননীকে সঙ্গী করতেন। তাঁর বন্ধু মনীন্দ্র রায়কে লেখা একটি চিঠি থেকেই বোঝা যায় ননীকে তিনি কতটা ভালবাসতেন। তিনি লিখেছিলেন: আমার ননী গেছে ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি, কাল শুক্রবারে আসবে। যদি যেতেও হয়, ওকে নইলে যাওয়া হবে না।

ননীর বাড়ি ছিল গোবিন্দপুরে তাঁর দিদির বাড়ির পাশে। ননী সামতাবেড়ে গিয়ে সারাদিন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে কাজ করত, রাত্রে আবার নিজের বাড়ি চলে যেত। এমনি একদিন ননী তার নিজের বাড়িতে ঘুমিয়ে। হঠাৎ মাঝরাত্রিতে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি শুরু হলো। খবর এল, ননীকে সাপে কেটেছে। শরৎচন্দ্র ঐ সংবাদ পেয়েই সেখানে ছুটলেন। বাড়ির লোক কান্নায় ভেঙে পড়ল। ননীর তখনও জ্ঞান আছে, কাঁদতে কাঁদতে বললো: বাবু, আমায় বাঁচান।

কৈশোরে শরৎচন্দ্র অনেক সাপ ধরেছেন। সাপ নিয়ে খেলাও করেছেন। পরবর্তীকালে ঐ সাপ নিয়ে লেখা বহু বই পড়েছেন। সাপের বিষ, তার প্রতিক্রিয়া, এবং নানা টোটকা-টাটকি ও ওষুধ নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটিও করেছেন। সুতরং ননীকে সাপে কামড়ানোর পর তাড়াতাড়ি তিনি সেইসব ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। এবং বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বুঝলেন, ননীর শরীরে সাপে কামড়ানোর যে দাগ তা বিষধর কোন সাপের হবে। গ্রামবাসীদের ডাকে ইতিমধ্যে সাপের ওঝা এল। মন্ত্রতন্ত্র পড়া শুরু হলো। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাতে কোন বাধা দিলেন না। রোগী এবং তার আত্মীয়দের

মানসিক বল বাড়ানোর জন্য তিনি ঐ ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্যও করলেন না।

দেখতে দেখতে রাত্রি ভোর হলো। শরৎচন্দ্র এতক্ষণ সেই অপেক্ষাতেই ছিলেন। এবার পাল্‌কি করে দেউলি স্টেশনে পাঠিয়ে ননীকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেন। এবং সঙ্গে তাঁরই বিশেষ বন্ধু এবং স্নেহভাজন চিকিৎসক ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায়ের কাছে একটি চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন, যাতে ননীর চিকিৎসার কোনরকম ত্রুটি না হয়।

এদিকে ননীর চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে শরৎচন্দ্র বসে রইলেন না। সাপুড়েদের ডাকিয়ে এনে ননী যে ঘরে শুয়ে ছিল, সেই ঘরের মেঝে খুঁড়ে তিনি সাপটা ধরালেন। উদ্দেশ্য, ঐ সাপ ধরে যদি ননীকে বাঁচানোর ব্যাপারে কোন সাহায্য করা যায়। গ্রামের লোকের বিশ্বাস ছিল, সাপ ধরে সেই সাপ দিয়ে ওঝারা রোগীর শরীরের বিষ তুলে নিতে পারে। শরৎচন্দ্র তাই সারাদিন ঐ কাজেই ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কলকাতা থেকে খবর এল, ননী পথেই মারা গেছে। যারা কলকাতা গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তারা শরৎচন্দ্রকে সব বললেন। শরৎচন্দ্রের দু'চোখে তখন জল। করুণ চোখে শরৎচন্দ্র শুধু বললেন: সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে আছি কিছু ভালো সংবাদের আশায়। তোমরা এ কী খবর আনলে?

শরৎচন্দ্র ননীর মৃত্যুতে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। তার পরিবার ছিল খুবই গরীব। তাই যতদিন শরৎচন্দ্র বেঁচে ছিলেন, ননীর পরিবারকে তিনি অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্তও তিনি ননীকে ভুলতে পারেননি।

ননীর আগে শরৎচন্দ্রের আরেকটি ভৃত্য ছিল। তার নাম ছিল। ভোলা। ভোলা অবশ্য বাঙালী ছিল না। উড়িষ্যাবাসী। ভোলাও শরৎচন্দ্রের খুব প্রিয়পাত্র ছিল। মাঝেমধ্যেই ভোলা প্রভুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দেশে যেত। ভোলাকে ছেড়ে শরৎচন্দ্র যেমন

অসহায় হতেন—ভোলাও শরৎচন্দ্রকে ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকতে পারত না। ভোলা বেশ সৌখিন ছিল। তার দেশের অবস্থাও ছিল স্বচ্ছল। শরৎচন্দ্র দিল্লী, বৃন্দাবন যেখানে যখন গেছেন, বাহন ভোলাকে তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। ভোলা তাঁর ভৃত্য হলেও শরৎচন্দ্র তাকে কোনরকম তাচ্ছিল্য করতেন না। দরদী শরৎচন্দ্র ভোলার অসুখ-বিসুখ, সুবিধা-অসুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ভোলাকে নিয়ে শরৎচন্দ্র ১৩৩২ সালে একবার ভাগলপুর যান। সেখানে মহাধুমধাম করে তাঁর মামাবাড়ি জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। সেই পুজোর মধ্যে ভোলা অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্র সেই উৎসবের বাড়িতে বসেও ভোলার জন্য কতটা চিন্তিত, তা তাঁর একটি চিঠি থেকেই পরিষ্কার। ঐ বছর ভাগলপুর থেকে ১৫ই কার্তিক তিনি তাঁর প্রকাশক-বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন : ...জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এখানে এসে আটকে গেছি। আমার ভোলা চাকর কালা জ্বরে শয্যাগত। বহু ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আরাম করে সঙ্গে আনি। এখানে পূজা বাড়ির খাদ্য এবং অখাদ্য খেয়ে তার জ্বর এবং পিলে এমনি দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে যে সে অপ্রত্যাশিত।

বিচিত্র অভিযান : প্রেমতলী আর সুন্দরবন

শরৎচন্দ্রের শৈশব কেটেছিল বিহারের ভাগলপুরে তাঁর মামা-বাড়িতে। সেখানে তিনি যে মুক্তজীবনের স্বাদ পেয়েছিলেন, পরবর্তী-কালেও তা আর ভুলতে পারেননি। শৈশব আর কৈশোরের স্মৃতি-জড়িত ভাগলপুর জীবনের শেষদিন পর্যন্তও তাঁকে আকর্ষণ করেছে। খ্যাতির চূড়ায় যখন শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত, তখনও তিনি ভাগলপুরের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। তাই পরবর্তীকালে যখনই সুযোগ পেতেন একবার ছুটে যেতেন ভাগলপুরে। তাঁর মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঐ প্রসঙ্গে একসময় 'কল্লোল' পত্রিকায় লিখেছিলেন : …এখনও সে বিনা আহ্বানে—কেবলমাত্র প্রাণের টানে এক একবার ভাগলপুর ছুটিয়া আসে। এখন বয়স হইয়াছে, তবুও সেই পাথরঘাটের ভগ্নস্তূপের চূড়া হইতে ঝাঁপ খাইয়া জলে পড়িয়া সাঁতার দিবার ইচ্ছা তাহার তরুণ বয়সের মতই আছে। গঙ্গার ওপারের ঝাউ বনের ডাক আজিও তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উচ্ছসিত হইয়া এখনও তাহাকে বলিতে শুনি—ওঃ, বড় ভাল জায়গা, এই ভাগলপুর।…

ভাগলপুর থেকে সেবার কলকাতা ফেরার পালা। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একটু আগেই ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে বসলেন। তারপর শরৎচন্দ্র স্থির করলেন, যে ষ্টীমার আগে আসবে তাতে চড়েই গন্তব্যস্থানে রওনা হবেন। ইতিমধ্যে 'ভেনাস' নামে একটি ষ্টীমার এল। শরৎচন্দ্র সদলবলে ঐ ভেনাসেই উঠে পড়লেন। তখনকার দিনে পাটনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটা 'ষ্টীমার সার্ভিস' ছিল। ঐ ষ্টীমার পাটনা-ভাগলপুর হয়ে গিয়ে পদ্মায় পড়তো। তারপর গোয়ালনন্দঘাট হয়ে কলকাতার পথে রওনা হতো। ঐ যাত্রাপথে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও পার হতে হতো।

ষ্টীমার নদীপথে মাঝে-মাঝেই বিভিন্ন গ্রামে নোঙর করত। সেই-সব গ্রামে যাত্রী ওঠা-নামা করত। আবার কখনও-বা যাত্রীরা বিভিন্ন গঞ্জ বা হাট থেকে খাবারদাবার কিনে নিত। এমনি এক গ্রামে এসে ভিড়ল ষ্টীমার 'ভেনাস'। গ্রামের নাম প্রেমতলী। পদ্মাপারের সবুজগ্রাম প্রেমতলীতে তখন এক মেলা চলছিল। শরৎচন্দ্র শুনলেন, ঐ প্রেমতলীর মেলা খুবই আকর্ষণীয় হয়। নানাস্থান থেকে দলে দলে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা ঐ মেলায় আসেন। নাচ-গান সঙ্গীতের আসর বসে সেখানে। শরৎচন্দ্র ঐ খবরে খুব উৎফুল্ল হলেন। স্থির করলেন, 'ভেনাস' ছেড়ে ঐ প্রেমতলীতে নামবেন এবং প্রয়োজনে দু-একদিন সেখানে থাকবেন। পদ্মাতীরের সবুজঘেরা ঐ প্রেমতলীতে সব মালপত্র নিয়ে শরৎচন্দ্র নেমে পড়লেন। সঙ্গের বন্ধুরাও তাঁর অনুগামী

না হয়ে পারলেন না। নেমেই তাঁরা প্রেমতলীর কাছারি বাড়ি গিয়ে উঠলেন। সেখানেও ভীড়—স্থানাভাব।

তিলক কাটা নর-নারীর ভীড়ে জমিদারের ঐ কাছারি বাড়িও ঠাসা ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে তারা একটু অবাক হলো। নবাগত শরৎচন্দ্রকে দেখে তাদের ধারণা হলো—তিনি বোধহয় মুসলমান। তাই সেইসব বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করল। সমস্বরে তারা বলে উঠল: দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমাদের সঙ্গে যে রাধিকারমন আর শ্যামসুন্দর আছে। শরৎচন্দ্রকে পাশ কাটানোর জন্য ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল। শরৎচন্দ্র প্রথমে হতবাক। তারপর বিষয়টা বুঝতে পারলেন এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন: আমি পবিত্র বামুন, তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো—বলেই তিনি পৈঁতে দেখিয়ে তাদের শান্ত করলেন।

সুরেনবাবু ঐ প্রসঙ্গে লিখেছেন: ...আমাদের দেখিয়া তাহারা (বৈষ্ণবরা) প্রথমে অবাক হইল। তাহার পর সামাল সামাল করিয়া একদিকে সরিয়া যাইতে লাগিল...

কলিমদ্দিবিনিন্দিত শ্মশ্রুগুচ্ছ, গায়ে সবুজ চেকদার র‍্যাপারে সজ্জিত এক নবাগতকে দেখিয়া সেখানকার ভক্ত নর-নারীবৃন্দ আর্তনাদ করিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্রকে তাহারা মুসলমান মনে করিয়াছিল।...

শেষ অবধি তাঁরা জমিদারের কাছারি বাড়িতেই থাকবার ব্যবস্থা করলেন। এবং তার কিছুক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র মেলা দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক বেলা হলো। তিনি ফিরছেন না দেখে সঙ্গীদের চিন্তা হলো। সঙ্গী সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু তাঁকে খুঁজতে বেরুলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা মেলার একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে অস্বাভাবিক ভীড় দেখে সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কৃষ্ণবর্ণ এক বাউল এক গৌরাঙ্গিনীকে ঘিরে নাচছেন, এবং

মনমাতানো কীর্তনগানে সভা মশগুল করছেন। আর শরৎচন্দ্র তাঁদের পাশে বসে তন্ময় হয়ে তা দেখছেন ও শুনছেন।

এমন সময় শরৎচন্দ্রকে তাঁরা ডাকলেন। শরৎচন্দ্র কিছুটা বিরক্ত। বললেন : দুপুর হয়েছে হোক। রোজই তো নাই-খাই। দেখো না—কী ভক্তি এদের। ভক্ত শরৎচন্দ্রের হাবভাব দেখে সুরেনবাবু এবং গিরীনবাবু অবাক।

ঐ প্রেমতলী গ্রামের মেলায় গিয়ে শরৎচন্দ্র খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। কলকাতার পথে রওনা হয়ে মাঝপথে যে হঠাৎ করে তিনি নেমে পড়েছিলেন, বোধকরি তিনি তা বেমালুম ভুলে যান। প্রেমতলীতে তিনি দু-একদিন থাকবেন স্থির করলেন। মেলা থেকে ফিরে গিয়ে খেতে বসে গল্পে গল্পে সঙ্গীদের বলেন : আরও দিন কয়েক এখানে থাকতে হবে। 'বৈষ্ণব গ্রহণ ব্যাপারটা' নাকি খুবই ইন্টারেস্টিং।

সুরেনবাবু মজার ঐ ব্যাপারটি জানতে চাইলে শরৎচন্দ্র বললেন : এখানে একটা আখড়া আছে। মাত্র পাঁচসিকে পয়সা জমা দিয়ে বোষ্টমীরা গিয়ে সেখানে নাম লেখায়। আর যেসব বোষ্টম বোষ্টমী চায়, তাদেরও পাঁচ সিকে জমা দিয়ে নাম লেখাতে হয়। তারপর? তা আরও মজাদার। একটা বড় কাপড় দিয়ে বোষ্টমীর সমস্ত দেহ ঢেকে দেওয়া হয়। পায়ের একটি আঙুল শুধু বার করে রাখা হয়। সেই আঙুল দেখে যার ভাগ্যে যে ওঠে, তাকেই বোষ্টমী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। এবং তাকে নিয়েই এক বছর ঘর করতে হয়।

সুরেনবাবু তো খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে শরৎচন্দ্রের কথাগুলি শুনলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন : এটা তোমার উদ্ভট গল্প।

শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন : বেশ তো—দুটো দিন থেকেই যাও না। দেখবে—যা বলছি তা কতটা সত্যি।

শরৎচন্দ্রের অনুরোধ প্রায় কাজে লাগল। গিরীনবাবুকে নিয়ে

শরৎচন্দ্র আবার মেলা দেখতে গেলেন। গেলেন সেই আখড়ার সন্ধানে। আর সুরেনবাবু কাছারিতেই অপেক্ষা করতে থাকলেন মালপত্র নিয়ে। ওঁরা দুজন রাত্রে মেলা থেকে ফিরে আসতেই সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কী হে বৈষ্ণবী সংগ্রহের খোঁজ পেলে?

শরৎচন্দ্র একটু হেসে জবাব দিলেন: শুনলাম ঐ প্রথা হঠাৎ উঠে গেছে। শরৎচন্দ্রের জবাব শুনে সুরেনবাবু একটু গম্ভীর। তিনি বুঝলেন, বৈষ্ণবী গ্রহণের মনগড়া রোমান্টিক ঐ গল্প বলে শরৎচন্দ্র তাঁদের আরও একদিন প্রেমতলীতে আটকে রাখার ফন্দী করেছেন। তিনি এবার বললেন: মেলা তো দেখলে, এবার বাপু চলো। নতুবা মশার কামড়ে আর ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

মশা ও ম্যালেরিয়ার কথা শুনে শরৎচন্দ্র আর আপত্তি করলেন না। বললেন: চলো—নৌকা ভাড়া করে রাজশাহী রওনা হই। কথামত কাজ হলো। নৌকা ভাড়া করে ওঁরা মালপত্র নিয়ে তাতে উঠে পড়লেন। পদ্মার বুক বেয়ে রওনা হলেন রাজশাহীর দিকে। এর মধ্যে হঠাৎ একটি ষ্টীমারের আলো দেখতে পেয়ে শরৎচন্দ্র হাত তুললেন। দেখলেন, 'মার্স' নামে একটি ষ্টীমার গোয়ালনন্দ যাচ্ছে। রাত্রের এই নৌকা অভিযান ছেড়ে আবার তাঁরা উঠলেন ঐ ষ্টীমারে। তারপর আর রাজশাহী নয়—পরের দিন সোজা গিয়ে গোয়ালনন্দ স্টেশনে পেঁছুলেন।

গোয়ালনন্দ পেঁছেই শরৎচন্দ্র অস্থির হয়ে উঠলেন। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরবেন। পথে বেরিয়ে কোথাও তিনি স্থির হয়ে বেশি সময় থাকতে পারতেন না। তাই ঠিক করলেন, গোয়ালনন্দ থেকে ট্রেন ধরে সরাসরি কলকাতা পেঁছুবেন। কিন্তু খোঁজ করে জানতে পারেন, তখন ফেরার আর কোন ট্রেন নেই। তাঁর আর দেরী সইল না। চলার পথে তিনি থামতে চান না। অধৈর্য শরৎচন্দ্র এবার 'মহাদেব' নামে একটি ষ্টীমারের সন্ধান

পেলেন। শুনলেন চা বোঝাই করে ঐ মালবাহী ষ্টীমার সুন্দরবন হয়ে কলকাতা যাচ্ছে। পৌঁছুতে দিন পাঁচ-ছয় সময় লাগবে।

শরৎচন্দ্র ঐ নতুন অভিযানের কল্পনায় মেতে উঠলেন। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, নদীর চড়ায়, জলে ও ডাঙায় হাঙর-কুমীর, বানর আর সুন্দরী গাছের ডালে ডালে বিচিত্র বর্ণের সব পাখি এবং অতিকায় অজগরের নিঃশঙ্ক বিচরণ—এসব চিত্র যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সঙ্গী সুরেনবাবু এবং গিরীনবাবু প্রথমে সুন্দরবন হয়ে সুদীর্ঘ জলপথে কলকাতায় ফিরতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের নানা বর্ণনায় তাঁরাও শেষ পর্যন্ত 'সুন্দরবন অভিযান' সম্বন্ধে আগ্রহী হলেন। শরৎচন্দ্রের লোভনীয় বক্তব্য : এমনও দেখা যেতে পারে, হয়তো একটা অতিকায় অজগর সাপ গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে একটা আস্ত মোষকে গিলে খাচ্ছে।...

শরৎচন্দ্রের বিচিত্র বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে সুরেনবাবু মালপত্র ও ঠাকুর-চাকর নিয়ে অবশেষে ট্রেন যাত্রা বাতিল করে 'মহাদেবেই' চাপলেন।

পরবর্তীকালে সুরেনবাবু 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে তাঁদের ঐ সুন্দরবন যাত্রার যে বর্ণনা করেছেন, তাতে লিখেছেন : ...মহাদেব (ষ্টীমার) চলিয়াছে প্রমত্ত অধৈর্যে। কোথাও থামে না। যাত্রীর তোয়াক্কা নেই। শুধু ছোটা, উল্কা গতিতে ছুটিয়া চলাই তাহার একমাত্র কাজ।

আবার কয়েকদিনের জন্য বন্দী আমরা।...

শুধু জলে হাঙর-কুমীর, আর স্থলে রয়েল বেঙ্গলের আশায় দিন কাটিয়া যায়।...কিন্তু আমাদের ভাগ্যে একটি কাঠবিড়ালীর লেজও চোখে পড়িল না।...

মালবাহী জাহাজ 'মহাদেবে' চড়ে তাঁরা নদীঘেরা ভয়ঙ্কর সুন্দরবন পাড়ি দিলেন।

ডায়মণ্ডহারবার হয়ে তাদের ষ্টীমার 'মহাদেব' খিদিরপুরের কাছে

এসে ভিড়ল। শরৎচন্দ্র সঙ্গীদের বললেন: বাঘ-কুমীর দেখতে পাওনি তা ঠিকই, কিন্তু সুন্দরবনের যে সৌন্দর্য দেখলে, তার মূল্যও কি কম?

শিকারী শরৎচন্দ্র

কৈশোরের স্মৃতি ভুলতে পারেননি বলেই হয়তো শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সেও সুযোগ পেলেই রূপনারায়ণের বুকে নৌকা নিয়ে ভেসে বেড়াতেন। ঐ বেড়ানো কখনও কখনও উদ্দেশ্যহীন হতো, আবার কখনও-বা উদ্দেশ্যমূলক। রূপনারায়ণের চড়ায় নানা ধরনের পাখির মেলা বসত। গাঙচিল থেকে শুরু করে পানকৌড়ি সহ আরও বিচিত্র কত পাখি। ঐসব পাখি শিকারে শরৎচন্দ্রের মাঝে মাঝেই আগ্রহ প্রকাশ পেত। যখন তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন, তখনও সেখানকার বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে তিনি পাখি শিকারে বেরুতেন। এবং ঐ পাখি শিকারের জন্য কখনও রেঙ্গুনের ঘন বনে, আবার কখনও-বা ইরাবতীর বুকে পাড়ি দিতেন।

সামতাবেড়ে থাকাকালে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর ভাগ্নেদের ডেকে এক প্রস্তাব দিলেন। বললেন: চলো, একঘেয়েমী আর ভালো লাগছে না। রূপনারায়ণের চড়ায় পাখি শিকার করে আসি। আর খাওয়াদাওয়া? নদীর বুকে নৌকোতেই সব ব্যবস্থা করা যাবে।

যে কথা সেই কাজ। ভাগ্নেরা মা-বাবার অনুমতি নিল। যথাসময়ে হাঁড়ি-কড়া, ঠাকুর-চাকর নিয়ে সবাই নৌকায় উঠল। সবার শেষে উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্র। সঙ্গে তাঁর দোনালা একটি বড় আকারের বন্দুক।

নৌকা ছাড়ল। রূপনারায়ণের বুকে দুলে দুলে নৌকা এগোতে লাগল। মাঝিদের হাত থেকে বৈঠা নিয়ে ভাগ্নেরা কখনও

নৌকা বাইতে লাগলো। কেউ হাল ধরে বা নৌকার গতি পরিবর্তনে ব্যস্ত। ওদিকে ঠাকুর-চাকর সবাই দুপুরের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত। শিকারী শরৎচন্দ্রের কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে তিনি এদিক-ওদিকে পাখিদের আনাগোনা লক্ষ্য করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পড়ে হঠাৎ তিনি দেখলেন, এক ঝাঁক বেলেহাঁস উড়ে যাচ্ছে। শিকারী শরৎচন্দ্র এবার খুব উৎসাহী হলেন। ভাগ্নেকে বললেন: তোরা সব তৈরি থাক—ঐ বেলেহাঁসের ঝাঁক বন্দুকের আওতার মধ্যে এলেই গুলি ছুঁড়বো। সঙ্গে সঙ্গে হাঁসগুলি তুলে নিতে হবে।

এদিকে বন্দুকে টোটা ভরা শেষ। অধীর আগ্রহে তিনি লক্ষ্য করছিলেন পাখির ঝাঁক কতক্ষণে তাঁর কাছাকাছি আসে। তিনি বন্দুকের গুলি ছুঁড়বেন। পাখি শিকারের প্রস্তুতি হিসাবে তাড়াতাড়ি করে তিনি বন্দুকটা তুলে পাখির ঝাঁক তাক করতে গেলেন। ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। বন্দুকের ঘোড়ায় হাত লেগে যেতেই গুড়ুম গুড়ুম কয়েকবার শব্দ হলো। তার এক ভাগ্নে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। শরৎচন্দ্রের হাত থেকেও বন্দুক পড়ে গেল। ভয়ে তিনিও তখন কাঁপছেন। বুঝতেই পারলেন না কীভাবে বন্দুকের ঘোড়ায় টান পাড়ল। শঙ্কিত শরৎচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে ভাগ্নেকে তুলে বসালেন। দেখলেন, অতি অল্পের জন্য সে বেঁচে গেছে। গুলি তার কোথাও লাগেনি।

শিকারী শরৎচন্দ্র এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গম্ভীরভাবে ভাগ্নের উদ্দেশে বললেন: আজ তোকে তো মারছিলামই, আমিও মরতাম। তোর মৃতদেহ নিয়ে তোর মায়ের কাছে যাওয়ার আগে যে আমাকেই এই বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করতে হতো।

যতদূর জানা যায় ঐ শিকার অভিযানই শরৎচন্দ্রের পাখি শিকারের শেষ অভিযান।

পাখি শিকারের মতো মাছ ধরাতেও শরৎচন্দ্রের বেশ উৎসাহ

ছিল। ঐ মাছ ধরার ইতিহাস কিশোর শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। পরবর্তীকালেও অবশ্য তিনি মাছ ধরার আনন্দ ভুলতে পারেননি। সামতাবেড়ের বাড়ির কাছে তিনি যে দু'টি বড় পুকুর কাটিয়েছিলেন, ছিপ ফেলে সেখানে প্রায়ই তাঁকে মাছ ধরতে দেখা যেত। রেঙ্গুনের প্রবাস জীবনে তো মাছ ধরা তাঁর প্রায় একটা নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। মাছ ধরার ব্যাপারে তিনি যে কতটা উৎসাহী ছিলেন, রেঙ্গুন থেকে, ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর কলকাতার বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠি থেকেই তা বোঝা যায়। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: ৪।৫ জোড়া গায়ে গাঁথা বঁড়শি—বড়ো সাইজের ২।৩ জোড়া, মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কড়া ও হাতে ভাঙা মুগার সুতা—ভাই নিশ্চয়ই দিও।...

রেঙ্গুনে থাকাকালে শরৎচন্দ্রের মাছ ধরার সঙ্গী ছিলেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার। গিরীনবাবুর সঙ্গে তিনি পেগুতে একবার মাছ ধরতে গেলেন। যে পুকুরে তাঁরা ছিপ ফেললেন, দেখলেন তার অনেক আগে থেকেই আরেক সাহেব সেখানে ছিপ ফেলে অধীর আগ্রহে বসে। ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁদের আলাপ-পরিচয় হলো। তাঁর নাম চার্লস কোন্‌স। মাছ ধরায় তাঁরও খুব আগ্রহ আর উৎসাহ। দেখলেন, সাহেব মাছ ধরতে বসেছেন বিরাট এক সংসার নিয়ে। অর্থাৎ বাক্স ভরতি হরেকরকম খাবার, সুইটকেস, মদের বোতল, বন্দুক, চাকর-বাকর সবই তাঁর সঙ্গে। এত ঘটা করে মাছ ধরতে বসলেও তাঁর ছিপে তখনও পর্যন্ত কোন মাছ উঠেনি। কিছুটা হতাশা নিয়েই তিনি ছিপ হাতে বসেছিলেন। সাহেব ভালো বাঙলাও জানতেন। নতুন দুই মাছ শিকারি বন্ধু পেয়ে তিনি বেশ গালগল্প করছিলেন। এমন সময় শরৎচন্দ্রের ছিপে একটি বড় আকারের মাছ ধরা পড়ল। গিরীনবাবু আর শরৎচন্দ্রের সে কি আনন্দ! সাহেব নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে শরৎচন্দ্রের বরাতের প্রশংসা করলেন। এবং তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

এরপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ওদের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়লো। সাহেবের মুখে পরিষ্কার বাঙলা শুনে শরৎচন্দ্র অবাক। জানতে চাইলেন: অত পরিষ্কার বাঙলা তিনি কোথায় কীভাবে শিখেছেন?

সাহেব বললেন: এক সময় তিনি কোলকাতায় ছিলেন, সেই সুবাদেই তিনি বাঙলা ভাষা শিখেছেন। রেঙ্গুনে বার্মা চেম্বার অব কমার্সের তিনি একজন কর্মকর্তা। মাছ ধরার সখের জন্য তিনি রেঙ্গুনসহর থেকে গাড়ি করে প্রায়ই পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী ঐ পেগুতে যাতায়াত করে থাকেন।

সাহেবের কথা শুনে শরৎচন্দ্র অবাক। কৌতূহল বশে সাহেবকে প্রশ্ন করেন: সহর ছেড়ে এতদূরে এসে সারাদিন কাটালেন, অথচ একটা মাছও তো ধরতে পারলেন না! বাড়ি গিয়ে কী বলবেন?

গোবেচারার মতো সাহেব সব স্বীকার করলেন।

বললেন: বাড়ি ফিরে আজ একটু বে-ইজ্জত হতে হবে বৈকি! কেননা, এতদূরে মাছ ধরতে যাতায়াত করায় স্ত্রী খুব একটা খুশি নন।

সাহেবের কথা শুনে শরৎচন্দ্রের বোধ হয় একটু করুণা হলো। তিনি সসঙ্কোচে প্রস্তাব করলেন: কিছু ভাববেন না। আমার মাছটা আপনি বাড়ি নিয়ে যান।

শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবে সাহেব কিছুটা বিস্মিত হলেন। তারপর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন: আপনার মাছটা এমনিতেই আপনি দিয়ে দেবেন?

হেসে শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন: তাতে কী আছে? একটা মাছের চেয়ে বন্ধুত্বের মূল্য অনেক বেশী। বাড়ি গিয়ে এ মাছ দেখিয়ে আগে তো আপনার মান বাঁচান। তারপর—

কৃতজ্ঞচিত্তে সাহেব মাছটি গ্রহণ করলেন। এবং সেই দিন থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও গাঢ় হলো। পরবর্তী সময়ে সাহেবের

সঙ্গে শিকারি শরৎচন্দ্র বহুবার বিভিন্ন জায়গায় মাছ ধরতে গেছেন। গিরীন সরকারের মতো চার্লস কোন্‌সও হয়েছেন তাঁর মাছ ধরার সঙ্গী

নানা শখ : পশুপ্রীতি

শরৎচন্দ্র একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলে কথাশিল্পীর অসুস্থতায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী তো খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলেন। একদিকে তিনি যেমন স্বামীর নীরব্ সেবায় নিষ্ঠাবতী, অন্য দিকে ঠাকুর দেবতার উদ্দেশে স্বামীর মঙ্গল কামনায় মুখর। অবশেষে তিনি মানত করলেন : স্বামী সুস্থ হয়ে উঠলে কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীর উদ্দেশে জোড়া পাঁঠা বলি দেবেন।

শরৎচন্দ্র সত্যিসত্যি যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন। হিরন্ময়ী দেবী তখন স্বামীর কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করলেন। পাঁঠা বলির কথা শুনেই শরৎচন্দ্র চমকে উঠলেন। বললেন : সে কী কথা—আমার জীবনের জন্য দুটি পশুবলি ? না, শরৎচন্দ্র তাতে সায় দিতে পারলেন না। পশুবলির ব্যাপারে তাঁর সবসময়ই আপত্তি ছিল। তিনি অবশ্য স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর ধর্ম-বিশ্বাসে বাধা দিলেন না। দু'টি পাঁঠার দাম তিনি কালীঘাটে কালীবাড়ি পাঠিয়ে সেখানে পূজার সব আয়োজন করে দিলেন।

সামতাবেড়ে থাকাকালে শরৎচন্দ্র একদিন বেড়াতে বেরিয়েছেন, একদল লোকের ভীড় দেখে সেখানে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন : তারা সবাই মিলে একটা খাসি কিনেছে। উদ্দেশ্য, খাসিটাকে কেটে ভাগা-ভাগি করে তারা মাংস নেবে। তার ব্যবস্থাও প্রায় পাকাপাকি।

খাসিটা কাছেই বাধা ছিল। খাসিটার দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্রের কেমন যেন মায়া হল। তিনি এগিয়ে গিয়ে উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাইলেন, কত টাকা দিয়ে খাসিটা কেনা হয়েছে। সব শুনে শরৎচন্দ্র বললেন: বেশতো, আপনারা যে দামে কিনেছেন, তার চেয়েও আমি বেশি টাকা দিচ্ছি। খাসিটা আমাকে দিয়ে দিন।

গ্রামের ঐ মানুষগুলি শরৎচন্দ্রকে চিনত, শ্রদ্ধা করত। তাদের নানা বিপদে যে তিনি ঝঁাপিয়ে পড়েন, তাও তাদের অজানা ছিল না। তাই শরৎচন্দ্রের বাসনাপূর্ণ করতে কেউই তারা আপত্তি করল না। বরং যে দামে তারা খাসিটা কিনেছিল, সে-দামেই শরৎচন্দ্রকে তা দিয়ে দিল।

খাসি নিয়ে শরৎচন্দ্র মহানন্দে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে খাসি দেখে বাড়ির লোক অবাক। শরৎচন্দ্র বললেন: অবাক হওয়ার কিছু নেই। গৈরিক রঙের এই খাসিটা দেখতে যেমন হৃস্টপুষ্ট, ওর চোখেমুখেও তেমনি পৌরুষের ছাপ। তাই ওকে আমার বাড়িতেই রাখব। আর ডাকবো ওকে, স্বামীজি বলে। যে কথা সেই কাজ। মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে শরৎচন্দ্র খাসিটাকে নিজের বাড়িতেই রাখলেন, প্রতিপালন করতে লাগলেন। 'স্বামীজিও' কিছুদিনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের অনুগত হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্র একবার স্বামীজি বলে ডাক দিলে সে ছুটে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াত, শরৎচন্দ্র তাকে আদর করতেন তার সুবিধা-অসুবিধা দূর করার জন্য সকল রকম ব্যবস্থা করতেন।

তারপর অনেকদিন কাটল। একদিন স্বামীজি মারা গেল। শরৎচন্দ্র তার মৃত্যুতে বেশ আঘাত পেলেন। ব্যথিত শরৎচন্দ্র তাঁর খাতার পাতায় লিখলেন: ১৩ই মাঘ, ১৩৩৯ (বেলা ১১-৩), বৃহস্পতিবার, স্বামীজির মৃত্যু—আর একটা ভাবনা ঘুচলো।...

রেঙ্গুনের প্রবাসী জীবনেও শরৎচন্দ্রের পশুপাখি পোষার বিচিত্র সব ঘটনা আছে। সেখানে তিনি একটি পাখি কিনে আদর করে

তার নাম দিয়েছিলেন 'বাটু'। ঘোর লাল রঙের পাখিটির ডানা দুটির রঙ ছিল সবুজ। বাটু অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কথা বলতে শিখেছিল। শরৎচন্দ্র সময় পেলেই তাকে আদর করতেন, আর 'বাটুবাবা' বলে ডাকতেন। বাটুও তার মনিবের কাছে কিচিরমিচির করে নানা সুখ-দুঃখের কথা জানাতো।

বাটুর জন্য শরৎচন্দ্রের চিন্তার অন্ত ছিল না। তার জন্য ছোট ছোট সব বাটি কেনা হয়েছিল। সেসব বাটিতে সব সময়ই নানা-ধরনের খাবার সাজানো থাকত। কোনটায় আনারসের কুঁচি অথবা আঙুর ফল, কোনটায় আবার পেস্তা-বাদাম অথবা কিসমিস। যখন যে ফল পেতেন, শরৎচন্দ্র তখনই তাঁর বাটুবাবার জন্য তা কিনে নিতেন। বাটু শেষ পর্যন্ত খুব সুন্দর কথা শিখেছিল। শরৎচন্দ্রকে দেখলেই বাটু স্পষ্ট ভাষায় 'বাবা' বলে ডাকত।

বাটুর প্রতি শরৎচন্দ্রের অপরিসীম ভালোবাসা ছিল। রেঙ্গুন ছেড়ে তিনি যখন চলে আসেন, নানা অসুবিধার কথা ভুলে তিনি বাটুকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। রেঙ্গুনের বাটু হাওড়ায় এসেও দশ বছর শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল। শরৎচন্দ্র বাড়ি করে যখন সামতাবেড়ে চলে যান, সেই পল্লীভবনেও বাটুকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান।

তারপর একদিন বাটুর মৃত্যু হলো ঐ সামতাবেড়েতেই। শরৎচন্দ্র বাটুবাবুর মৃত্যুতে খুবই বেদনাহত হন। নিজেই তাকে সমাহিত করেন। তারপর নিজের খাতায় লিখে রাখেন: বন্ধন থেকে সে নিজেই শুধু মুক্তি পেলে না, আমাকেও একটা মস্ত মুক্তি দিয়ে গেলো।...

আপনজনের মতো করেই শরৎচন্দ্র বাটুর মৃত্যুর সময় ও তারিখের বিস্তৃত বিবরণ লিখে রাখেন: ...আজ রাত্রি ১০-৪৫-এ বাটুর মৃত্যু হলো। মঙ্গলবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৮। সামতাবেড়ে...।

•

রেঙ্গুন, কলকাতা ও সামতাবেড়ে থাকার সময় শরৎচন্দ্র কাকাতুয়া, ময়ূরসহ নানা পশুপাখিও পুষেছিলেন। শুধু দামী ও

বিদেশী পশুপাখির প্রতিই তাঁর আকর্ষণ বা ভালোবাসা ছিল না। পাড়াগাঁয়ের সাধারণ কুকুর-বেড়ালকেও তিনি ভালোবাসতেন, আদর করতেন। সামতাবেড়ে বাড়ি করে তিনি সেখানে লাল রঙের একটি দেশী কুকুর সংগ্রহ করেন। তেজী কুকুরটির রঙ বাঘের মতো ছিল বলে তিনি তার নামকরণ করেন 'বাঘা'। বাঘার জন্য কোন শিকল বা দড়ি ছিল না। সারারাত বাঘা প্রভুর বাড়ি পাহারা দিত, বিনিময় প্রভুর কাছ থেকেও সে প্রচুর আদর-যত্ন পেত। দিনের বেলায় সে এ-পাড়া সে-পাড়ায় ঘুরে বেড়াত।

একদিন বাঘা পাশের গ্রামে গিয়ে দিনের বেলায় একটা শেয়ালকে তাড়া করে। শেয়ালটা ছিল পাগলা। সে উল্টে বাঘাকে আক্রমণ করে। দুপক্ষেই বেশ কামড়া-কামড়ি হয়। শরৎ-চন্দ্রের কানে সেই খবর এল। তিনি আর দেরী করলেন না। পাগলা শেয়ালের কামড়ে বাঘার যে জীবন সংশয় হতে পারে, তা তিনি আশঙ্কা করে চিকিৎসকের কাছে ছুটলেন। চিকিৎসা হলো। কিন্তু বাঘাকে আর বাঁচানো গেল না। সযত্নে রাখা তাঁর খাতায় মৃত্যু-তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হলো। লিখলেন: ...আজ বাঘা মারা গেলো। মোহিনী ঘোষালের বাড়ির সম্মুখে কি জানি কবে তাকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল।...

শরৎচন্দ্র যতসব পশুখাখি পুষেছেন, ভেলুই বোধকরি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আদরের ছিল। ভেলুকে নিয়ে তিনি নানাস্থানে ঘুরেছেন। যখন তিনি তীর্থযাত্রায় কাশীধাম যান, ভেলু তখনও তাঁর সঙ্গী।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের কী শখ হয় কে জানে। মাত্র আট আনার বিনিময়ে তিনি একটি বাচ্চা কুকুর কেনেন। শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থাও তখন খুব একটা সচ্ছল নয়। যেদিন তিনি ঐ কুকুর-বাচ্চাটি কেনেন, তার পরের দিনই তিনি ডাকযোগে তাঁর বকেয়া প্রাপ্য প্রায় দুশো টাকা হাতে পান। তা পেয়ে শরৎচন্দ্র ভাবলেন,

কুকুর-বাচ্চাটি খুবই পয়মন্ত। সেই থেকে কুকুরটিকে তিনি ভেলু বলে ডাকেন এবং পুত্রস্নেহে লালনপালন শুরু করেন।

১৯২৫ সালের কথা। ১০ ও ১১ই এপ্রিল দুদিনব্যাপী ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। শরৎচন্দ্র তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। কারণ, শরৎচন্দ্রের একান্ত প্রিয় ভেলু তখন অসুস্থ। ভেলুর অসুস্থতা শরৎচন্দ্রকে খুবই বিচলিত করল। তিনি বেলগেছিয়ার পশু-চিকিৎসা-কেন্দ্রে ভেলুকে ভর্তি করালেন। তারপর প্রতিদিন সেখানে তাকে দেখতে যান।

এদিকে সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষও শরৎচন্দ্রকে না নিয়ে ছাড়বেন না। ভেলুর অবস্থা একটু ভালো শুনে শেষ অবধি তিনি মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে যান। সম্মেলন শেষে শরৎচন্দ্র ঢাকায় তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি যান। সেখান থেকে সরাসরি হাওড়ায় ফিরে আসেন। ঢাকা থেকে ফিরে এসে তিনি বন্ধুবর চারুচন্দ্রকে যে চিঠি দেন, তা থেকেই বোঝা যায় ভেলুর জন্য শরৎচন্দ্রের কতটা উৎকণ্ঠা ছিল। ১৯২৫ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে তিনি লেখেন: ···আজ আমার চিঠিপত্র লেখবার মত মনের অবস্থা নয়। তবুও তোমাকে এই কথাটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তোমার হয়তো মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে একটা মৃতপ্রায় বাছুর, তারপরেই একটা জবাইকরা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন?···

তারপর তোমরা স্টেশন থেকে চলে গেলে গাড়ি ছাড়বার পরেই দেখি, রাস্তার ধারে একপাল শকুনি আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর (ভেলু) ছিল হাসপাতালে। মন যে আমার কি খারাপ হয়ে গেলো তা লেখা যায় না। ইংরাজিতে যাকে বলে 'সুপারস্টিশন'

সে আমার নেই। কিন্তু তিন তিনটা মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্তের শান্তি দিলে না। বাড়ি এসে শুনলাম, ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।...

ভেলুর কুশল সংবাদ পেয়ে শরৎচন্দ্র কিছুটা নিশ্চিত হলেন। তিনি তখন গাড়ি করে ভেলুকে বাড়ি নিয়ে গেলেন, পাছে হাসপাতালে তার কোন অসুবিধা হয়। কিন্তু বাড়ি নেবার পরই সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবং তার মাত্র ক'দিনের মধ্যেই ভেলু মারা যায়। ভেলুর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন : ...গত বৃহস্পতিবার আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পেঁছাই। তখনি বেলগেছে হাসপাতাল থেকে তাকে মোটর করে বাড়ি আনি। এসেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে।... সাত দিন সাত রাত খাইনি, ঘুমাইনি। তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টায় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষদিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।...

বুধবারে জোর করে কড়া ওযুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি। চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা করেও ওষুধ তার পেটে গেল না। কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না! ভোর বেলায় সে কান্না তার থামলো।...

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিলো। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর একটা কথাই শুধু মনে হতে লাগলো—'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা।' তার আঘাত ছিলো। কিন্তু অবহেলা ছিলো না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাইনি ?...ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধুবান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করাতে। অর্থাৎ পাগলা কুকুর কামড়ানোর পরে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চলবে। ২৮টা ইনজেক্শনের আজ ১০টা ইনজেক্শন হয়ে গেল। আরও ১৮টা বাকি। তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচতেই হবে। কারণ 'ইওর লাইফ

ইজ ট্যু ভ্যালু:য়েবল'। দেখাই যাক—'ভ্যালু:য়েবল লাইফের' শেষটা কি দাঁড়ায়।...

শরৎচন্দ্রের ভেলু তদানীন্তন বহু সাহিত্যিকের লেখায় অমর হয়ে আছে। যাঁরাই শরৎচন্দ্রের কাছে গেছেন, ভেলু তাঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। সাহিত্যিক জলধর সেন ছিলেন 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক। মাঝেমধ্যেই তিনি শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় যেতেন। ভেলুর প্রসঙ্গে জলধর বাবু লিখেছেন:

শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিলো। তিনি বিলাতি নহেন—খাঁটি দেশী। তার নাম ছিলো ভেলু। শরৎচন্দ্র কুকুরটির এ নামকরণ কেন করেছিলেন তা জানিনে। কুকুরটি দেখতে ছিলো কদাকার, আর তার আচরণ ছিলো অতি অভদ্র। যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করতো। শরৎদর্শন প্রার্থীবৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্ম-রক্ষার্থে দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন। ভেলুর গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই বলতেন—'এই ভেলু!' আর অমনি মেষ শাবকের মত দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসতো। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালবাসতেন, তা আর বলতে পারিনে।

সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাড়িতে যত রকমের চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করলেন। দু'হাতে অর্থব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন। ...ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচেছিলো, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নান-আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে থাকতে দেয়ার আদেশ থাকতো, তা'হলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জর প্রান্তেই বসে থাকতেন। কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না।...আমি সংবাদ পেয়ে সেইদিনই শিবপুরে

গেলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্র জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন: দাদা, আমার ভেলু আর নেই। তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হলো না।

১৯২০ সালে শরৎচন্দ্র সপরিবারে একবার কাশীধামে যান। ঐ তীর্থযাত্রায়ও ভেলুকে তিনি সাথী করেছিলেন। সাহিত্যিক মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: শিবালয়ে একখানা ভালো বাড়িই শরৎবাবু ভাড়া করিয়া বাসা পাতিয়াছিলেন।...শরৎবাবুর প্রিয় কুকুরটিও সঙ্গে আসিয়াছিলো। তাহার সম্বন্ধে কত কথাই তিনি শুনাইলেন। সে কি খায়, কি ভালবাসে, কিসে রাগিয়া উঠে, কোন কোন লেখা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে সমস্তই আমাদিগকে শুনাইলেন...।'

একবার তিনি কয়েক মাসের জন্য রেঙ্গুন থেকে কলকাতা আসেন। সঙ্গে স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী এবং ভেলুকেও নিয়ে আসেন। কিন্তু হঠাৎ খবর পেয়ে তিনি একাই রেঙ্গুন চলে যেতে বাধ্য হন। পরে হিরন্ময়ী দেবীকে রেঙ্গুনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ঐ বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য শরৎচন্দ্র তাঁর কলকাতারবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে যে চিঠি দেন, তাতেও তিনি ভেলুর কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারেননি। তিনি লিখেছিলেন: ...এঁকে এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না। তাঁর তো প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবামাত্র একখানা টিকিট রিজার্ভ করিবার জন্য বি, আই, এস, এনকে ইন্টিমেশন দিও। তাহারাই বলিয়া দিবে, কোন্ জাহাজে বার্থ পাওয়া যাইবে। তারপর যেদিন হোক্, টাকা লইয়া টিকিট লইয়া আসিও। তাঁর ৪৫,+ভেলুর ৪,=৪৯ টাকা।

ভেলুর শৈশবে শরৎচন্দ্র তাকে কিনেছিলেন। এবং শেষদিন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কাছেই সে ছিল। প্রায় ১৬ বছরের জীবনে ভেলু শরৎ-চন্দ্রের মনে যেভাবে জায়গা করে নিয়েছিল, আর কোন পশুপাখিই

বোধহয় তা পারেনি। শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও তা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন : ওর আগে পরে অনেক কেউ এলো গেলো, কিন্তু ও যেন মাঝের মণি-কটি।

শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি সম্বন্ধে নানা কাহিনী নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। অসহায় পশুপাখির স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিতেও তিনি পিছ-পা হতেন না।

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনের একটা দোতালা কাঠের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। সম্ভবতঃ সেটা ১৯১২ সালের গোড়ার কথা। তাঁর বাড়ির পাশের একটি ধোপার ঘরে কীভাবে যেন আগুন ধরে যায়। গভীর রাত্রের আগুনের আক্রমণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ বিচলিত ও বিব্রত-বোধ করে। ঘুম ভাঙা চোখে সকলে বাড়ি ছেড়ে বাইরে ছুটে যায়। শরৎচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীও আর পাঁচজনের মতো ঘর ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়ান। সকলের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক।

এমন সময় শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন, যে ধোপার ঘরে প্রথম আগুন লাগে কিছু মালপত্র ও গাধা নিয়ে ভয়ে সে ঘরের বাইরে চলে এসেছে। কিন্তু তাড়াহুড়া করে আর তার ছাগলছানাটি ঘর থেকে বার করে আনা সম্ভব হয়নি। অসহায় ছাগলছানাটির কথা শুনে শরৎচন্দ্র শিউরে উঠলেন। ভাবলেন, যে করেই হোক—অবলা ঐ ছাগশিশুটিকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। তিনি তাই সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবন বিপন্ন করে জ্বলন্ত ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। পাড়াপড়শী পরিচিতরা হৈ হৈ করে উঠল। শরৎচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য তখন তিনি উদ্‌গ্রীব।

মাত্র কয়েক মিনিট। শরৎচন্দ্র প্রায় আধ-মরা ছাগলছানাটিকে কোলে করে ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। আগুনের হলকায় তিনি কিছুটা আহত হলেন। তবুও তাঁর চোখে-মুখে তখন পরিতৃপ্তির ছাপ। অসহায় ছাগশিশুটিকে উদ্ধার করতে পেরে তিনি তখন মহাখুশি।

১৯৪৪ সালের বৈশাখ মাসে শরৎচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদেশ্যে দেওঘর বেড়াতে গেলেন। সেই সময় পথে ঘোরা বেওয়ারিশ একটি কুকুরকে দেখে তাঁর করুণা হয়। তিনি কুকুরটিকে ডেকে নিয়ে প্রতিদিন নানারকম খাবার দিতেন, যত্ন করতেন। আদর করে পথের পথিক ঐ কুকুরটিকে তিনি অতিথির মতো সেবা করতেন। এবং 'অতিথি' বলেই তাকে ডাকতে শুরু করেন। অতিথিও শরৎচন্দ্রের অনুগত হয়ে পড়ে।

শরৎচন্দ্র যখন দেওঘর ছেড়ে চলে আসেন, তখন ঐ অতিথির জন্য তাঁর মন খারাপ হয়। চলে আসার দিন, ৩০শে বৈশাখ, বেওয়ারিশ কুকুর, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের আদরের অতিথির উদ্দেশে তিনি লেখেন :

গেটের বাইরে সবার গাড়ি এসে দাঁড়ালো। মালপত্র বোঝাই-দেওয়া চললো। অতিথি মহাব্যস্ত। কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটো-ছুটি করে খবরদারি করতে লাগলো—কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করলে। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নাব্‌তে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিলে—কি জানি, মানে তার কি!

টিকেট কেনা হলো। মালপত্র তোলা হলো। বন্ধু এসে খবর দিলেন ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিলো তারা বক্‌সিস পেলে সবাই। পেলে না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপ্‌সা দেখতে পেলাম, স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলি মনে হতে লাগলো অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ—ঢোকবার যো নেই। হয়তো পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাটবে, হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে

লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা। তারপরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

হয়তো ওর চেয়ে তুচ্ছ জীবন সহরে আর নেই। তবুও দেওঘর বাসের ক'টা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।'

পথেঘাটে বেওয়ারিশ কুকুরের দুর্দশা প্রায়ই শরৎচন্দ্রকে বিচলিত করত। তিনি সুযোগ পেলেই পথের কুকুর ডেকে নিয়ে দোকান থেকে খাবার কিনে দিতেন। কাশী গিয়ে শরৎচন্দ্র সেবার উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে ওঠেন। বেওয়ারিশ কিছু কুকুরের দুর্দশা দেখে প্রসঙ্গে তিনি সুরেশবাবুকে বলেছিলেন: পথের কুকুরগুলো দেখলেই আমার কেমন কষ্ট হয়। এদের দেখবার কেউ নেই। কেউ এদের আদর করে কোনদিনই খেতে দেয় না। বরং দেখতে পেলে অনেকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বেচারাদের জীবন সত্যই দুঃখের। আমার যদি টাকা থাকতো, তা' হলে আমি এদের জন্য একটা অন্নসত্র খুলে দিতাম।

পশুপাখির প্রতি শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত দরদ ছিল বলেই হয় তো এক সময় তাঁকে পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির (ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনসন অব ক্রুয়েলিটি টু এনিম্যালস) সদস্য করে নেওয়া হয়েছিল। ক্রমে তিনি পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার সভাপতিও নির্বাচিত হন।

সেটা ১৯৩০ সাল। কেউ কোন পশুপাখির ওপর যাতে নিষ্ঠুর ব্যবহার না করে, তার জন্য পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি সংশ্লিষ্ট আইনের কড়াকড়ি করলেন। ঐ আইন ভঙ্গকারীদের প্রয়োজনীয় শাস্তি বিধানেরও ব্যবস্থা হলো। গরু-মোষ বা ঘোড়ায় টানা গাড়ির গাড়োয়ানদের ওপরও ঐ আইন প্রয়োগের নির্দ্দেশ হলো। গাড়োয়ানরা তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। নিবারণী সমিতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানাতে সোচ্চার হলো। এ নিয়ে অতঃপর কলকাতা ও হাওড়ায় ভীষণ মারদাঙ্গা দেখা দিল।

ওদিকে শরৎচন্দ্রের তখন ঢাকা যাওয়ার আমন্ত্রণ। তিনি যেদিন ঢাকা রওনা হবেন, সেদিন জানতে পারলেন গাড়োয়ানরা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির আইনের প্রতিবাদে ধর্মঘট করবে। সেই খবর পেয়ে তিনি তাঁর ঢাকা যাত্রা বাতিল করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে ঐ প্রসঙ্গে লিখলেন :

ভাই চারু, আজ ঢাকার জন্য রওনা হয়েও বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োওয়ানের দল ধর্মঘট এবং সত্যাগ্রহ করায় অর্থাৎ সি, এস, পি, এস, এ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে। সার্জেণ্টদের সঙ্গে পেটাপেটি হয়— কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুন্‌ছি ৪ জন মরেছে।

ও তো গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাবড়া সহরেও (শরৎচন্দ্র 'হাওড়া'কে সব সময় 'হাবড়া' বলে উল্লেখ করতেন) সি, এস, পি, সি, এ আছে এবং আমি তার চেয়ারম্যান। এও একটা বড় ডিপার্টমেণ্ট। আজ হাবড়ার ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস, পি কোন মতে হাবড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে। কিন্তু কাল কি ঘটবে বলা যায় না। অথচ এই ডিপার্টমেণ্টের কর্তা হয়ে আমার এ সময় কোথাও যাওয়া চলে না। এই জন্যই মাঝ পথ থেকে ফিরে যাচ্ছি।...

জানি তুমি অতিশয় দুঃখিত হবে। এই না যাওয়াটা আমার নিতান্তই দৈবের ব্যাপার।...

শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার লিখেছেন : ...অনেকদিন পরে কাল (২৪-১-৩০) হাওড়া সি, এস, পি, সি, এ অফিসে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এখন ঐ সমিতির সভাপতি। অবলা পশুর দুঃখে তাঁহাকে অনেক সময় অত্যন্ত ব্যথিত হইতে দেখিয়াছি। হাওড়ার পুলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহাকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া, কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া দেখি যে, একটি মহিষ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অতিরিক্ত ভার বহন করিতে না পারিয়া মুখ থুবড়াইয়া

পড়িয়া গিয়াছে। তাহার নাক দিয়া বিন্দুবিন্দু রক্ত পড়িতেছে এবং শকটচালক তাহাকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করিতেছে।...

পশুক্লেশ নিবারণী সভার সভাপতি হওয়া তাঁহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক এবং উপযুক্ত হইয়াছে।

মূক জীবে প্রীতি তাঁহার অসাধারণ ছিলো। দ্বিপ্রহরে শকট-মহিষের ক্লেশ দেখিয়া হাওড়ার পুলের উপর তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। বাজেশিবপুর রোডে কালীবাড়িতে ছাগ বলি হইতেছে, শুনিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত হইয়া কটুভাষা ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি।...

শুধুমাত্র মূক পশুপাখি, জন্তু-জানোয়ারই নয়। বিষধর সাপের ওপরও শরৎচন্দ্রের কেমন যেন মায়া ছিল। কৈশোরে তিনি সাপ ধরেছেন, সাপ নিয়ে খেলেছেন, এমন সব রোমাঞ্চকর বহু ঘটনার কথাও শোনা যায়। তবে কখনও তিনি সাপ মেরেছেন বলে জানা যায়নি। তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ির লাগোয়া এলাকার ঝোপঝাড়ে অনেক বিষধর সাপ ছিল। সেসব বিষধর সাপকে কেউ তাড়া করলে তিনি তাকে বাধা দিতেন। শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: শরতের সাপের উপর আজীবন ভালবাসা ছিলো। সামতাবাড়িতে শীতের দুপুরে সামনের বাগানের ঘাসের উপর বড় বড় সাপ রোদ পোয়াতো। শরৎ পাহারা দিচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের মানা করছেন, 'ওরে তোরা ওদিকে যাসনে। আহা! ওরা একটু রোদ পোয়াচ্ছে। তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।'

খেয়ালী মানুষ : দরদী মন

আমি একজন গরীব লেখক, আমি আর কি উপহার দোব? বড়লোকের বাড়ির কাজে উপহার না দিলেও চলবে।—কথাগুলো বলেছিলেন শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলাদেবীকে।

শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। অবস্থাপন্ন পরিবারের লোক। সেই বাড়িতে সেবার তাঁর ভাইপোর পৈতে হচ্ছিল। অনিলাদেবী তাই তাঁর ভাই শরৎচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন, ঐ অনুষ্ঠানে সে কি উপহার দেবে। অনিলাদেবী খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাইয়ের উপহার দেওয়া নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। খেয়ালী ভাইয়ের চরিত্র তাঁর জানা ছিল। তাছাড়া ভাইয়ের দেওয়া উপহারের সঙ্গে যে তাঁর বাপের বাড়ির মানসম্মানও জড়িত।

অনুষ্ঠানের দিন বোনের বাড়িতে লোকজনের ভীড়—আনন্দ-উৎসব। নানা ধরনের মূল্যবান উপহার দেওয়া-নেওয়া চলছে। সবাই লক্ষ্য করছেন, কে কি দিচ্ছেন, না দিচ্ছেন। এমন সময় শরৎচন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। তারপর দুটো আধলা (তখনকার দিনে আধ-পয়সা বা আধলা প্রচলিত ছিল) হাতে দিয়ে তিনি উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে দিলেন। উপহারের নমুনা দেখে আত্মীয়-স্বজনরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর হাসাহাসি শুরু করলেন। শরৎচন্দ্র খুব স্বাভাবিক এবং সাধারণভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। পুরো ব্যাপারটা দেখে তাঁর দিদি লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলেন।

উৎসবমুখর বাড়ির উঠোনে একটু পরেই শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে তাঁর ভগ্নীপতির সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করছেন। হঠাৎ শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন: আপনার তো দেখছি দুটো খড়ের গাদা আছে। একটা গাদার খড়েই আপনার গরুর বছরের খোরাক হয়ে যাবে। বাকি

গাদাটা আমার কাছে বেচে দিন—বলেই শরৎচন্দ্র ভগ্নীপতির হাতে একশটি টাকা গুঁজে দিলেন।

ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখার্জি তো অবাক। শরৎ রসিকতা করছে কিনা, তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। টাকা হাতে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

শরৎচন্দ্র এবার একটু প্রস্তুত হয়ে নিয়ে বললেন: দুলে পাড়ার ঐ গরীব মানুষগুলোর অনেকের ঘরের চালে খড় নেই। ক'দিন ধরেই তা দেখছিলাম। তার জন্য ওদের কষ্টও হচ্ছে খুব—বলতে বলতে শরৎচন্দ্র কিছুটা আনমনা হলেন। কাছেই ছিল দুলেপাড়া। তারপর এগিয়ে গেলেন দুলেপাড়ার দিকে।

শরৎচন্দ্র দুলেপাড়ায় বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাই শরৎচন্দ্রের 'খড় উপহারে' তারা আনন্দে মেতে উঠল। দুলেপাড়ার মানুষ সারবেঁধে খড় নিতে শুরু করল। পাশে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র তা তদারক করতে লাগলেন।

উৎসবের বাড়িতে আরেক উৎসবের সূচনা হল। এতক্ষণ যাঁরা উপহারের প্রতিযোগিতায় ঘরের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরাও বাইরে এলেন। তাঁদের হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ সব মুহূর্তেই থেমে গেল। ঐ উপহারপর্ব উপস্থিত সকলকে হতবাক করে দিল। শরৎচন্দ্রের মুখে তখন তৃপ্তির ছাপ।

দুলেপাড়ার সেই ঘটনার পেছনে ছিল শরৎচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা। তিনি নিজেই লিখেছেন: এমন দিন গেছে, যখন দু'তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়িতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক। কত হাড়ি বাগ্দির বাড়িতে আহার করেছি।··· তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি, পল্লীগ্রাম ও পল্লী-সমাজ।

শরৎচন্দ্র শিবপুরের যে বাড়িতে থাকতেন তার কাছাকাছি এক

বাড়িতে বিরাজ-বৌ নামে নিঃসন্তান এক বিধবা ছিলেন। তাঁকে দেখবার মতো কোন নিকট আত্মীয় ছিল না। অভাবী বিধবা বিরাজ-বৌ কোনদিন কারোর কৃপা বা সাহায্যপ্রার্থী হননি। তাঁর আত্মসম্মানবোধ বড় বেশি ছিল। তিনি তাই মুড়ি ভেজে তা বিক্রী করতেন। এবং তা থেকে যে পয়সা পেতেন তা দিয়েই সংসার চালাতেন।

শরৎচন্দ্রের কানে এল বিরাজ-বৌ-এর অভাবের কথা। তিনি তাঁর আত্মসম্মানবোধের কথাও শুনলেন। তিনি বুঝলেন, সরাসরি কোন সাহায্য তাঁকে দেওয়া সম্ভব হবে না। অথচ তাঁকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি অনেক ভেবে স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে নির্দেশ দিলেন, প্রতিদিন ঐ বিধবার কাছ থেকে গরম মুড়ি কিনতে।

শরৎচন্দ্রের বাড়িতে মুড়ির সে রকম কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবুও নিত্য ঐ বিধবার কাছ থেকে মুড়ি কেনার জন্য তিনি ব্যবস্থা করলেন। প্রকারান্তে বিধবা বিরাজ-বৌ-এর অভাবী সংসারের সাহায্যের জন্যই যে শরৎচন্দ্র ঐ পথ নিয়েছিলেন, তা স্পষ্ট।

কাশী বেড়াতে গিয়েও শরৎচন্দ্র আরেক দুঃস্থ বিধবার সঙ্গে পরিচিত হন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ঐ মহিলা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে কাশীবাসী হন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর বৃদ্ধাকে তিনি 'বুড়ি-মা' বলে সম্বোধন করতেন। আর বৃদ্ধাও শরৎচন্দ্রকে 'ছেলে' বলে ডাকতেন।

শরৎচন্দ্র জানতেন, বৃদ্ধা অতি অসহায়া। তাকে দেখবার মতো তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। অতি কষ্টে তিনি সংসার চালান। শরৎচন্দ্র একদিন কথায় কথায় বুড়ি-মাকে যে-কোন ধরনের সাহায্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বুড়ি-মা কিন্তু তাতে সম্মত হলেন না।

শরৎচন্দ্র তখন নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেই বুড়ি-মাকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। অর্থাৎ তাঁর বন্ধু কাশীবাসী হরিদাস

শাস্ত্রীর মারফৎ তিনি ঐ আর্থিক অনুদান পাঠাতে লাগলেন। কী-ভাবে নিজেকে গোপন রেখে শরৎচন্দ্র ঐ অর্থ সাহায্য পাঠাতেন, শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির উল্লেখ করলেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। চিঠিখানি তিনি ঐ অসহায়া বিধবা বুড়ি-মাকেই লিখেছিলেন। চিঠির বয়ান :—মা, তোমার চিঠি পেয়েছি।—তুমি বাসা বদল করে ভালই করেছ। এঘর কি তোমার পছন্দ মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তো, হয়ত ২।১ টাকা ভাড়া বেশি দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। তোমার বাড়ি ভাড়ার জন্য চিন্তা করার আবশ্যক নেই। কারণ সে টাকা হরিদাস দেবে। তোমার কাছে তারা বাড়ি ভাড়া চাইবে না।—

বুড়ি-মাকে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছেন 'সে টাকা হরিদাস দেবে'। ঐ টাকা কি সত্যসত্যই হরিদাস শাস্ত্রী দিতেন? এ প্রসঙ্গে হরিদাসবাবুর একটি রচনা থেকেই তার প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাবে। ১৩৪৬ সালে সাহানা পত্রিকায় হরিদাস শাস্ত্রী লেখেন :—কিভাবে নিজেকে গোপন রাখিয়া তিনি সাহায্য দান করতেন, তার একটি প্রমাণ এর মধ্যে আছে। তিনি লিখিতেন, বাড়ি ভাড়া যাকিছু হরিদাস দিবে, উহা আত্মগোপনের প্রকার মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে টাকা তিনি (শরৎচন্দ্র) আমার কাছে পাঠাইতেন, আমি বুড়ি-মাকে দিতাম।

শরৎচন্দ্রের দরদী মনের ঐ পরিচয় সাধারণতঃ বাইরের কেউ জানতে পারতেন না। নিজেকে গোপন রেখে তিনি প্রকৃত অভাবীকে নানা সময় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। খেয়ালী শরৎচন্দ্রের দরদী মনের পরিচয় তখনকার দিনের তাঁর বন্ধুবান্ধব সকলেরই প্রায় জানা ছিল। তাই শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁদের সকলেরই প্রিয়, সকলেরই আপনজন।

বাড়ি গাড়ি এবং আরও কিছু

পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে …। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে দিব্যি ছিলাম। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেবতার আর সইল না—ঘাড়ে চাপলেন। …

ভাবচি, এটা কোন মতে শেষ হলেই পালাবো। সহরই মোটের ওপর সুসহ।… এই ক্ষোভ শরৎচন্দ্রের।

অনেক সাধ আর স্বপ্ন নিয়ে হাওড়ার এক গ্রামে গিয়ে শরৎচন্দ্র বাড়ি করেছিলেন। পল্লীবাংলার সরল সহজ মানুষের মেলা যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তাদের বঞ্চিত জীবনের নানা অভাব অভিযোগও তাঁকে পীড়িত করেছে। শরৎচন্দ্র তাদের হয়ে লড়াই করেছেন। স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর শোষকের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে গিয়ে তাঁর ক্লান্তিও এসেছে। পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের চোখেমুখে বঞ্চনার যে ছবি তিনি দেখতেন, প্রায়ই তাঁকে তা উতলা করে তুলতো। ঐসব দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে কথাশিল্পীকে বহু সময় লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এমন কি মিথ্যা মামলা দায়ের করেও তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করার চেষ্টা হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত গ্রাম-বাংলার জীবনযাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা বোধহয় তাঁকে নিদারুণভাবে হতাশ করেছিল।

গ্রামের পথঘাট এবং যাতায়াতের নানা অসুবিধার কথাও তিনি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। পল্লী উন্নয়নের জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁর গ্রামে যাতায়াতের বিবরণ দিয়ে বন্ধুবর মনীন্দ্র রায়কে তিনি লিখেছিলেন: … বৃষ্টি বাদলে রেল স্টেশনের একটি মাত্র পথ যা হয়ে আছে, তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্‌কি নিয়ে চলতে বেহারা আশঙ্কা করে, হয়তো পা পিছলে বাঁধ থেকে একেবারে খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা জায়গাতেই এসে

পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধা আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়। তাতেই দিব্যি খট্‌খট্‌ করে হেঁটে চলে। পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনও ওটা গজায়নি। তবে এরা ভরসা দিয়েছে, আরও দু'একবছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলেছি, খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম, সেখানেই ফিরে যাবো।...

শরৎচন্দ্রের গ্রাম ছেড়ে সহরে ফেরার সুপ্ত বাসনা ঐ পত্রেও ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া স্ত্রী হিরন্ময়ী দেঁবীরও ইচ্ছা ছিল কলকাতায় তাঁদের একটি বাড়ি করা হোক।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, শরৎচন্দ্র সে সময় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সুপরিচিত। নিয়মিতভাবে তখন তাঁর রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটার পর একটা উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে নিত্য নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। কলকাতার সঙ্গে তাই তাঁর নিয়মিত যোগাযোগও প্রয়োজন ছিল। অথচ সামতাবেড়ে থেকে কলকাতায় নিয়মিতভাবে যাতায়াত করায় তাঁর বেশ অসুবিধা হতো। তাই তিনি স্থির করলেন, কলকাতায়ও একটি বাড়ি করবেন। তাঁর ঐ সিদ্ধান্তর খবর শুনে সাহিত্যিক-সম্পাদক এবং প্রকাশক-বন্ধুরাও খুব উৎসাহ পেলেন এবং তাঁকে স্বাগত জানালেন।

দক্ষিণ কলকাতায় মনোহরপুকুর রোডে শেষ পর্যন্ত তিনি একখণ্ড জমি কিনলেন। তারপর যথারীতি ঠিকাদারের ওপর বাড়ি তৈরির দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। জমি কিনে দোতলা ঐ বাড়ি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে বেশ আর্থিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। ঐ সময় তিনি তাঁর প্রকাশক-বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন:

...আমার কলকাতার বাড়িটা শেষ হয়ে এলো। এ সময় আপনি আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা দিলে দুর্ভাবনা ঘোচে। যে তিনখানা নতুন বই শেষ হয়ে এলো, আশা হয় এর থেকে ওটা এক বছরেই শোধ করতে পারবে। বাড়িটার এস্টিমেট ছিলো চৌদ্দ হাজার টাকা, যাঁরা তৈরি করলেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিলো অর্ধেক টাকা

এ-বছর দেবো, বাকি অর্ধেক পরের বছরে দেবো। কিন্তু পাকেচক্রে খরচ বেড়ে গেল আরও হাজার তিনেক বেশি। নইলে টাকার দরকার হতো না। ধার না করে নিজেই দিতে পারতাম। এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার ষোল-সতেরো নষ্ট করলুম। কলকাতার বাড়িতেও বোধকরি হাজার তিরিশ নষ্ট হবে। এমনি করেই জীবন কাটলো। ...

বাড়ি তৈরি শেষ হলে ১৯৩৪ সালে শরৎচন্দ্র কলকাতার বাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ করেন'। কলকাতায় বাড়ি করলেও সামতাবেড়ের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না। ঘুরে ফিরে কখনও কলকাতা কখনও আবার সামতাবেড়েতে থাকতেন। পরিবারে লোকজনদেরও সেইভাবে থাকবার ব্যবস্থা করেন।

শররচন্দ্র কলকাতায় বাড়ি করলেন। রীতিমত তিনি তখন কলকাতা সহরের একজন প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। বালিগঞ্জে বাড়ি করার পর তাঁর একটি মোটর গাড়ি কেনারও শখ হয়। শখের চাইতে গাড়ির প্রয়োজনটাই বোধহয় তাঁর বেশি হয়ে পড়েছিল। কারণ, শরৎচন্দ্র যখন কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন, তখন তাঁর নামডাক এবং যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একাধারে লেখা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সাহিত্য সভা, প্রকাশকদের কাছে যাওয়া-আসা ইত্যাদি নানা কাজের চাপে তখন তাঁকে খুবই বিব্রত থাকতে হতো। তাই মূল্যবান সময়ের অপচয় বন্ধ করার জন্যও তাঁর একটি নিজস্ব গাড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই প্রয়োজন মেটাতে অবশেষে তিনি একটি 'মরিস মডেলের' মোটর গাড়ি কিনলেন। তাঁর গাড়ির চালকের নাম ছিল কালী।

শরৎচন্দ্র তাঁর গাড়ি নিয়ে খেয়াল-খুশি মতো মাঝে-মধ্যে উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গে তিনি সাধারণত একজন সঙ্গী রাখতেন। ১৩৪৩ সালের কথা। শরৎচন্দ্রের স্নেহ-ভাজন সাহিত্যিক অসমঞ্জস মুখোপাধ্যায় একদিন তাঁর কলকাতার বাড়ি যান। শরৎচন্দ্র তাঁকে সঙ্গী করে প্রথমে বোটানিক্যাল গার্ডেনে

প্রস্তাবিত একটি 'বনভোজনে' যোগ দিতে যান। সেখানে উদ্যোক্তাদের কাউকে না পেয়ে তিনি বিস্মিত হন। তারপর গাড়ির চালক কালীকে নির্দেশ দেন: সোজা রঙমহলে চল—ওখানে আমার 'চরিত্রহীন' অভিনীত হচ্ছে—আজ তাই দেখবো। রঙমহলের সামনে গিয়ে জানতে পারলেন, নাটক শুরু হতে তখনও অনেক সময় বাকি। তাই সরাসরি তিনি গেলেন বিচিত্রা অফিসে, ফড়িয়াপুকুরে। শরৎচন্দ্র বোটানিক্যাল গার্ডেনের 'বনভোজন' ও তার পরিণতির কথা বিচিত্রা অফিসে তাঁর মামা উপেন গঙ্গোপাধ্যায়কে বললে: তিনি হেসে উঠে বললেন: সে কী—ঐ বনভোজন তো পরের রোববার, আজ কেন সেখানে গিয়েছিলে?

আত্মভোলা শরৎচন্দ্রের তখন খেয়াল হল—। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আবার রঙমহল। সেখানে থেকে রাত্রে বাড়ি।

গাড়ি চড়ে যখন তিনি বেরুতেন, তখনও তাঁর মন গরীব মানুষের জন্য ব্যাকুল হতো। সেদিন বোটানিকাল গার্ডেন থেকে ফেরার পথে শিবপুরের কাছে তিনি দেখতে পান: গাছতলায় একটি লোক করুণ মুখে দাঁড়িয়ে। শরৎচন্দ্র চালককে গাড়ি থামাতে বললেন। বললেন: কালী, ঐ লোকটাকে ডেকে আনো। লোকটি কাছে এলে শরৎচন্দ্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কিছু খাবে?

লোকটি সানন্দে সম্মতি জানালো।

শরৎচন্দ্র তখন তাঁর হাতে দুটো টাকা দিলেন। তারপর কালীকে গাড়ি চালাতে বললেন। এবং স্বগত উক্তি করলেন: লোকটাকে দেখলে বড় অভাবী মনে হয়। হয়তো অনেকদিন খেতে পায়নি।

গাড়ি করে যেতে যেতে মাঝে মধ্যে শরৎচন্দ্র হাল্কা হাসির আসর জমাতেন। একবার বন্ধুবাড়ি যাচ্ছিলেন নিজের গাড়ি করে। গাড়ির চালক কালী ছাড়াও দু' একজন সঙ্গী ছিল গাড়িতে। পথের ভিড়ে তাঁর গাড়ি একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল।

শরৎচন্দ্র পেছনের আসনে হেলান দিয়ে এতক্ষণ কী যেন ভাবছিলেন। গাড়ি থেমে পড়ায় সবাই একটু বিরক্তিও বোধ করছিলেন। এমন সময় শরৎচন্দ্র মুখে কৃত্রিম একটা বিস্ময়ের ভাব করে বললেন : এ কি ব্যাপার!

গাড়ির সঙ্গীরা সচকিত হয়ে উঠলেন। কিছু বুঝতে না পেরে তারা চারদিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেলেন না।

শরৎচন্দ্র আবার স্বগত উক্তি করলেন : আশ্চর্য্য ব্যাপারই বটে।

গাড়ির সবাই এবার জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি?

গম্ভীরভাবে শরৎচন্দ্র এক পথচারীর মাথার পেছনের দিকটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন : বলতো, ওর মাথার টিকিটা অত ছোট করে ফেলেছে কেন?

বিস্মিত সঙ্গীরা একে অপরের দিকে তাকালেন। কোন জবাব দিতে পারলেন না।

শরৎচন্দ্র বললেন : টিকির ভেতর দিয়ে মগজে যে ইলেকট্রিসিটি পাস করে না, এটা বোধকরি এতদিনে ওরা বুঝতে পেরেছে। তাই বেচারি টিকির ওপর নির্দয়ভাবে লোকটা কাঁচি চালিয়েছে!

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে গাড়িসুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে শুধু বললেন : কালী, এবার গাড়ি ছাড়ো…

শরৎচন্দ্রের বিয়ে নিয়ে নানা জনের নানা মত। তাঁর প্রথম বিয়ে নিয়ে অবশ্য কোন মতান্তর নেই। শান্তি দেবীর সঙ্গে বিয়ে মাত্র দু' বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে হারান। ঐ প্রসঙ্গে তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার ব্রহ্মদেশে "শরৎচন্দ্র গ্রন্থে" লিখেছেন :···বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্র বেশিদিন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। যৌবনে তিনি স্ত্রীর খুব অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া আমি তাঁহাকে মহাস্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।

স্বপ্নবিলাসী শরৎচন্দ্রের প্রাণে ছিল অপূর্ব প্রেমের ভাণ্ডার। তিনি তাঁহার সমস্ত খুলিয়া দান করিয়াছিলেন স্ত্রী শান্তি দেবীকে। কিন্তু ভবিষ্যতের বিধান অন্য প্রকার থাকায় ঘটনা অন্যরূপ হইল। বিধির বিপাকে বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন।···

উপরের উল্লিখিত বক্তব্যে শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐ প্রসঙ্গে গিরীনবাবু আরও বলেছেন :···এই ঘটনায় (শান্তি দেবীর মৃত্যুতে) শরৎচন্দ্রের জীবনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল।··· দুই বৎসর পরে শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ির সন্নিকটে ৩৬ নং গলিতে বাড়ি ভাড়া করিয়া কয়েক বৎসর ছিলেন।···

গিরীনবাবু শরৎচন্দ্রের প্রবাস-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় বিয়ের কথা তিনি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তবুও ঐ দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনায় হিরন্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের

'জীবনসঙ্গিনী' বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন। জীবনসঙ্গিনীর অর্থ স্ত্রী বোঝালেও, তিনি স্ত্রী রূপে হিরন্ময়ী দেবীর স্বীকৃতি দেননি। তাঁর বক্তব্য: সামাজিক রীতিতে যাকে বিবাহ বলা হয়, সেই অর্থে নাকি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরন্ময়ী দেবীর বিয়ে হয়নি।

কবি নরেন্দ্র দেবও ছিলেন শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ও স্নেহাস্পদ বন্ধু। তিনি শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গে লিখেছেন: মধ্যে মধ্যে অল্প কয়েক দিনের জন্য বাংলাদেশে এসে ভাই-বোনেদের খবর নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে, শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। এমনি এক আসা-যাওয়ার মাঝে হিরন্ময়ী দেবী নামে একটি অসহায়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার "সঙ্গিনী-রূপে" গ্রহণ করেছিলেন। ইঁনি মেদিনীপুর নিবাসী ৺কৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের কন্যা।...

নরেন্দ্র দেবও তাঁর রচনায় হিরন্ময়ী দেবীকে 'সঙ্গিনী' বলে উল্লেখ করেছেন। সরাসরি তিনি কোথাও হিরন্ময়ী দেবীকে 'স্ত্রীরূপে' উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় না। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে হিরন্ময়ী দেবী সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক।

তবে ভরসার কথা, যাঁর বিয়ে নিয়ে নানা মত-মতান্তর, সেই শরৎচন্দ্র কিন্তু স্পষ্টভাবেই হিরন্ময়ী দেবীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্র স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর কথা বহুবার উল্লেখও করেছেন। হিরন্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কতখানি আদর যত্ন করতেন, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি থেকেই তার প্রমাণ মেলে: ...কোন-কালে আমি অম্বলের রোগী নই। এত কম খাই যে অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না—পাছে তাকেও-বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাইপাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে, আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠছে। আমি এদেশের বিখ্যাত কুঁড়ে, চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে—আমার ধাতে ও অত্যাচার সবে কেন?...কিন্তু

বাড়ির লোকে বোঝে না। তারা ভাবে, কেবল আমি না খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মতো হাতি হয়ে উঠবো।...আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না খেলে না—রোগা হয়ে গেলে—ঘর সংসার রান্নাবান্না কীসের জন্য—যেখানে দু'চোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো, ইত্যাদি কত কী! আমি বলি, ওরে বাপু বিবাগী হবে তো শীগ্‌গির হও—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়েই কাঁটা করে তুললে।...আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেখানে বোধ হয়, যেখানে এমন একজন আর একজনকে খাবার জন্য জবরদস্তি করে না।...

১৩৪৩ সালে, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে, তিনি স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে লিখলেন: ...বড়বৌ...সকলেই বলচেন ১ মাস ২ মাস থাকতে পারলে শরীর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে। দেখি, কতদিন থাকতে পারি। ভাবনা আমার তোমার জন্যই, পাছে অসাবধানে অসুখ-বিসুখ করে। কারণ তোমার অসুখ করেছে যেদিন কানে শুনতে পাবো, সেইদিনই দেওঘর ছেড়ে কলকাতা চলে যাবো।...

হিরন্ময়ী দেবী ছিলেন অশিক্ষিতা সরল স্বভাবের ধর্মপ্রাণা নারী। স্বামীর সেবা এবং পূজার্চনা নিয়ে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। ঘুম থেকে উঠে স্বামীর চরণামৃত বা পাদোদক না খেয়ে তিনি জল স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না। সরলপ্রাণা স্ত্রীর জন্য শরৎচন্দ্রেরও কম ভাবনা ছিল না।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারির গোড়ার কথা। অসুস্থ শরৎচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য তাঁকে পার্ক নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার সহ বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা তাঁর জীবন-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথও। দেশবরেণ্য নেতাদের উদ্বেগের কথা শরৎচন্দ্রকে কিছুই জানানো হল না—পাছে তিনি ভেঙে পড়েন।

শরৎচন্দ্র তবু হয়তো তাঁর জীবনের শেষের দিনের আগমনবার্তা শুনতে পেলেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর করুণ মুখের ছবি। তাঁর অসহায় জীবনের কথা ভেবে অসুস্থ শরৎচন্দ্র উতলা হলেন। তাই তিনি তাঁর বন্ধু সলিসিটর নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়েই ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে অনুরোধ করলেন, একটি উইলের বয়ান তৈরি করে দিতে। স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে কীভাবে কি তাতে উল্লেখ থাকবে তিনি নিজেই তার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশমত নির্মলচন্দ্র চন্দ্রও উইল তৈরি করলেন। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শরৎ-বন্ধু উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ঐ উইলে তিনি স্বাক্ষর করলেন।

যেদিন তিনি উইল করলেন, সেই তারিখটা ছিল ১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৮। তার মাত্র পাঁচদিনের মাথায়, ১৬ই জানুয়ারি, শরৎচন্দ্র ঐ নার্সিং হোমেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর সপক্ষে শরৎচন্দ্র যে উইল করেন, তার হুবহু অনুলিপি এখানে তুলে দেওয়া হল :

This is the last will and testament of me, Sarat Chandra Chatterjee, of No. 24, Aswini Dutt Road, within the municipal limits of Calcutta now lying at Park Nursing Home at Victoria Terrace in the town of Calcutta, I revoke all testamentary disposition if any heretofove made by me.

I give devise and bequeath all my estate and effects to my wife Sm. Hironmoyee Debi of No. 24, Aswini Dutt Road to be held and enjoyed by her for the term of her natural life subject nevertheless to the right of my brother to live in the premises No. 24, Aswini Dutt Road with his family as he is at the present doing and after my death and my wife's death my brother Prokash's son or sons who shall survive her shall be the absolute owner.

Not withstandig anything herein before contained my moneys in the Imperial Bank shall be spent only for the purpose of the marriage of my brother's daughter and if there shall be any surplus the same shall be spent for the use and benefit of my brother's children or of any of them.

I witness whereof I have set my hand to this as my last will and testament this the 11th day of January, 1938.

Sarat Chandra Chatterjee

Signed by the above named in our presence who at his request and in his presence and in the presence ofeach other have signed as attesting witness.

N. C. Chunder, Solicitor.
Calcutta.

Umaprosad Mookherjee,
Advocate, Calcutta High Court
11th January, 1938.

চিত্র-বিচিত্র

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে তিনি বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। শরৎচন্দ্রের নিষ্ঠা এবং তাঁর শক্তিশালী লেখনীর কথা গান্ধীজীও জানতেন। তাই শরৎচন্দ্রকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন।

শরৎচন্দ্র নিজে বহু বছর চরকা কেটেছেন, এবং খদ্দরও ব্যবহার করেছেন। তবু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চরকা কেটে অথবা খদ্দর পরে স্বরাজ আনা যাবে না। শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবে তৎকালীন

অনেক নেতা বিরূপ হয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর সমালোচনাও করেছেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এ নিয়ে নানা মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। গান্ধীজীও ব্যাপারটা জানতেন।

কলকাতায় এক ঘরোয়া সভায় একদিন মহাত্মা গান্ধী শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন: তুমি চরকায় বিশ্বাস কর কিনা?

শরৎচন্দ্রের সবিনয় উত্তর: না, চরকায় আমার বিশ্বাস নেই, মহাত্মাজী।

গান্ধীজী সবিস্ময়ে আবার প্রশ্ন রাখেন: কিন্তু তুমি তাহলে কী করে বহু চরকাপ্রেমিকের চেয়েও নিখুঁত এবং সুন্দরভাবে চরকা কাটো শরৎ?

শরৎচন্দ্র বললেন: চরকা কাটা আমি খুব ভালভাবেই রপ্ত করেছি। তার কারণ, আপনাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

গান্ধীজী এবার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন: চরকা যে স্বরাজ ত্বরান্বিত করতে পারে, তা তুমি বিশ্বাস কর কিনা?

বলিষ্ঠ শরৎচন্দ্র সবিনয়ে বললেন: না মহাত্মা, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে চরকা স্বরাজ তরান্বিত করতে পারে। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, একমাত্র নিষ্ঠাবান কর্মী এবং সৈনিকরাই দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তরান্বিত করতে পারে।

শরৎচন্দ্রের বিশ্বাসে মহাত্মা গান্ধী আর আঘাত হানলেন না। সব শুনে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি হাসলেন।

সেবার কলকাতা এসে গান্ধীজী দেশবন্ধুর বাড়িতে উঠেছেন। স্থির করলেন, তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'সার্ভেন্ট' কার্যালয় পরিদর্শনে যাবেন। ঐ পত্রিকাটি তখন জাতীয় আন্দোলনের শক্ত হাতিয়ার। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ঐ পত্রিকার সম্পাদক। তাছাড়া বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তিনি সভাপতিও। দেশবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সার্ভেন্ট কার্যালয়ে যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্রও তাঁদের সঙ্গী

হলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা সব দেখলেন। তারপর মহাত্মাজীর ইচ্ছা হল, সদলে তিনি ঐ কার্যালয়ে বসে আলোচনার ফাঁকে চরকাও কাটবেন। যথাসময়ে চরকা আনা হল। চরকা নিয়ে সবাই বসলেন গান্ধীজীকে ঘিরে। সবাই চরকা কাটায় মন দিলেন।

গান্ধীজী, দেশবন্ধু আর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কাছাকাছি বসেছিলেন শরৎচন্দ্র। শ্যামসুন্দরবাবু তখন বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

গান্ধীজী নিজের চরকা চালাতে চালাতে সকলের চরকার দিকেই লক্ষ্য রাখছিলেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন, চরকায় অবিশ্বাসী শরৎচন্দ্র নিখুঁতভাবে সূতা কাটছেন। আর তাঁরই পাশে বসে শ্যামসুন্দরবাবুর সূতা কাটা তুলনামূলকভাবে মোটা হচ্ছে।

রসিক গান্ধী বললেন: Look, look, the President of the B. P. C. C. is spinning rope.

গান্ধীজীর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। শরৎচন্দ্র এবার গম্ভীরভাবে বললেন: Nearer the Church, remoter from God.

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে গান্ধীজীও এবার আর না হেসে পারলেন না।

দেশবন্ধুর বাড়িতে সেবার মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বসে। নানারকম কথাবার্তা, গল্প-সল্প চলছে। কথায় কথায় কে একজন জানতে চাইলেন, কোন্ বাঙালীর সঙ্গে মহাত্মাজীর সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে?

প্রশ্নটা শুনে কিরণশঙ্কর রায় সগর্বে বলে ওঠেন: গৌরবটা আমারই প্রাপ্য। ব্যারিস্টারি পড়ার সময় আমি যখন বিলেতে, বুয়র যুদ্ধের অ্যাম্বুলেন্স কোরের একটা কাজে মহাত্মা গান্ধীও তখন সেখানে। তাঁর শখ হলো বাংলা শিখবেন। বাংলা শেখার জন্য তখন তিনি আমাকেই শিক্ষক রেখেছিলেন।

আশ্চর্য দেশবন্ধু রসিকতা করে প্রশ্ন করলেন: তাই নাকি, ছাত্রটিকে কতখানি বাংলা শিখিয়েছিলে কিরণ?

কিরণশঙ্করের সংক্ষিপ্ত উত্তর : ছাত্রটি তেমন ধারালো ছিলেন না। তাই খুব একটা শিখাতে পারিনি।

পাশে বসেছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সরাসরি মহাত্মা গান্ধীকেই প্রশ্ন করলেন : ইংলণ্ডে সত্যসত্যই কিরণশঙ্কর আপনার বাংলা-শিক্ষক ছিলেন কি ?

মহাত্মা বললেন : হ্যাঁ, ওঁর কাছে আমি বাংলা শিখতাম।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন : বুঝতে পেরেছি, ঐ জন্যই আপনি ভালো বাংলা শিখতে পারেননি।

সভায় হাসির বন্যা নামল। হাসলেন মহাত্মা গান্ধীও।

শরৎচন্দ্র কিন্তু তখনও গম্ভীর।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ দিলেন। নাটকের নামকরণ হল 'ষোড়শী'। ষোড়শী নাটকের খবরটা তাঁর বন্ধুবান্ধব মহলে ছড়িয়ে পড়ল।

খ্যাতিমান অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে হাজির। এর আগেই তিনি ষোড়শীর পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন : দাদা, ষোড়শী নাটক মঞ্চে খুবই জমবে। তবে শেষের দিকটা একটু বদলানো দরকার। অর্থাৎ জীবনানন্দকে মেরে ফেলতে হবে।

শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহাস্পদ বন্ধু অভিনেতা শিশিরকুমারের পরামর্শে ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন : একটুও আমি বদলাবো না—এমনকি একটা সংলাপ পর্যন্ত পরিবর্তন করবো না। তাতে তুমি আমার নাটক মঞ্চস্থ করো, চাই না করো।

শিশিরকুমার আর ঐ নাটক গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। শরৎচন্দ্রের তাতে আপশোষ নেই। বললেন : বেশ তো, আমি এ নাটক ষ্টার থিয়েটারে দেবো।

শিশির ভাদুড়ীর অভিমান হলো। বললেন : তা যাই হোক শরৎদা, এই নাটক হাতে ছাতা বগলে করে শেষ অবধি আমার

কাছেই যেতে হবে। সবিনয়ে দৃঢ়তা প্রকাশ করে শিশির ভাহুড়ী সেদিন বিদায় নিলেন।

একদিন ঐ নাটক নিয়ে শরৎচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারে গেলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোনও কারণে ঐ নাটক নিতে অসম্মতি জানালেন। ফলে আশাহত শরৎচন্দ্র একটু বিব্রত বোধ করলেন।

তারপরের ঘটনা। নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি নিজেই গেলেন শিশির ভাহুড়ীর কাছে। শিশিরবাবু শরৎচন্দ্রকে দেখে অবাক। সবিস্ময়ে তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন: শিশির, নাটক নিয়ে তোমার কাছেই এলাম। তবে তোমার কথামত ছাতাটা বগলে করে আনতে ভুল হয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের কথায় শিশিরবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। শিশিরবাবু বুঝিবা একটু লজ্জাও পেলেন। তারপর অন্য কথার রেশ টেনে তিনি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ঐ 'ষোড়শী' নাটক শিশিরকুমার ভাহুড়ীই তাঁর নাট্যমন্দিরে প্রথম মঞ্চস্থ করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে তা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

•

দিলীপকুমার রায় একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দু'জন নানা বিষয়ে আলোচনা করতে করতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে গেলেন। তারপর রাজনীতির সূত্র ধরে খদ্দরের কথা উঠল।

শরৎচন্দ্র তখন দিলীপবাবুকে বললেন: খদ্দর আর পরা চলে না দেখছি।

: কেন বলুন তো?

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন: ঐ খদ্দরের ভয়ে চাকরবাকর আর থাকতে চায় না। তারা বলে—কাপড় ধুতে গিয়ে ডোবাই বেশ, কিন্তু তুলবার সময় তার এত ওজন হয় যে তুলতে পারি না।

তারপর শরৎচন্দ্র একটু থামলেন। দিলীপবাবুর মুখের দিকে

করুণভাবে তাকিয়ে বললেন: চাকর-বাকরের কথা নয় বাদই দিলাম। আমি নিজেও দেখছি, তোমাদের ঐ চটের মত মোটা খদ্দরের ঘর্ষণে কোমরটা আমার একেবারে ক্ষতবিক্ষত।

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে দিলীপবাবু আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না।

কংগ্রেসের মধ্যেই দেশবন্ধু তাঁর অনুগামীদের নিয়ে 'স্বরাজ্য দল' নাম দিয়ে একটি আলাদা দল তৈরি করলেন। সালটা ১৯২১। বাংলাদেশের প্রতিটি কাগজ তাই দেশবন্ধুর সমালোচনায় মুখর। শুধু সমালোচনাই নয়—নানা মন্তব্য আর কটু-উক্তি প্রায় প্রতিদিনই শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

হাতে তাঁর টাকা নেই, সমর্থনের মত একটা কাগজ পর্যন্ত নেই। সে এক দুঃসময় চলছে দেশবন্ধুর জীবনে।

সেই সময় শরৎচন্দ্র একদিন দেশবন্ধুর বাড়িতে যান। অনুযোগের সুরে তাঁকে বলেন: আপনার মতে, ত্যাগ আর দুঃখ-বরণ ছাড়া যখন স্বরাজলাভ হবেই না, তখন আপনি একখানা পা কেটে ফেলুন। আর সবই যখন ত্যাগ করেছেন এবং চরম দুঃখবরণ করেছেন, তবে আর ওটা বাকি থাকবে কেন? ঐ চরম ত্যাগের মধ্য দিয়েই হয়তো স্বরাজ ত্বরান্বিত হবে।

বলতে বলতে শরৎচন্দ্রের চোখের কোণে বেদনার ছবি ফুটে ওঠে। তারপর নীরবে তিনি মোটা অঙ্কের একটি চেক দেশবন্ধুর হাতে তুলে দেন। বলেন: দেশের কাজে আমার নগণ্য দান।

সেবার কবি বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। দুজনেই দাবা খেলা জানতেন। দাবার ঘুঁটি গজ-ঘোড়া, নৌকো ইত্যাদি নিয়ে দুজনেই দাবা খেলতে বসলেন। খেলার শুরুতেই বসন্তবাবু পাকা খেলোয়াড়ের মতো শরৎচন্দ্রের একটি নৌকো মেরে দিলেন। শরৎচন্দ্র চেঁচিয়ে বলে উঠলেন: নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। নৌকোটা আমার ফুটো ছিল।

কথা শুনে বসন্তবাবু থামলেন, কিন্তু দমলেন না। আবার বেশ জমে উঠলো খেলা। ঠিক এই সময় বসন্তবাবু আবার একটি ঘোড়া জিতলেন। বিজয়ীর হাসি নিয়ে বসন্তবাবু শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন। শরৎচন্দ্রের মুখে পরাজয়ের ছাপ নেই, খুব স্বাভাবিক-ভাবে বললেন : জানো বসন্ত, ভালই হল। ওটা একটা বেতো ঘোড়া ছিল। যাক আস্তাবলটা ফাঁকা হল—বাঁচা গেল। বসন্তবাবু এবার না হেসে পারলেন না।

এদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর। বসন্তবাবু বললেন : বেলা হলো, এবার চলুন, খাবেন না ?

শরৎচন্দ্রের গম্ভীরভাবে সংক্ষিপ্ত জবাব : জানো তো খেলেই আমার আনন্দ…

কথাশিল্পীর কথার ফুলঝুড়িতে বসন্তবাবু বিব্রত বোধ করলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করে বললেন : পরিষ্কার করে বলুন—খেলেই বলতে আপনি কী বুঝাতে চাইছেন ? খেলা করতে না খেতে ?

শরৎচন্দ্র বললেন : দুটোই।

১৯২৩ সালের কথা। দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। শরৎচন্দ্র দিন কয়েক আগেই দিল্লীতে হাজির। সুভাষচন্দ্র ঐ অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লী যাবেন।

খবর নিয়ে শরৎচন্দ্র রেল-স্টেশনে গেলেন সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানাতে। স্টেশনে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দিলীপকুমার রায়।

শরৎচন্দ্র প্রথমে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তারপর কৌতূহলী প্রশ্ন : একি, মন্টুলাল, তুমিও সুভাষের সঙ্গে ? দিলীপ রায়ের ডাক নাম ছিল মন্টু।

দিলীপবাবু বললেন : কী আর করি, সুভাষ ছাড়লো না।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন : শেষ অবধি তুমিও সুভাষের পাল্লায়

পড়লে মণ্টু? শোন বাপু, ভালো চাওতো, ঘরের ছেলে আজই ঘরে ফিরে যাও। তুমি জেনে রেখো, 'হরিণ বাড়ির' চেয়ে 'মামা বাড়ি' অনেক ভালো।

দিলীপ রায় তখন কলকাতায় তাঁর মামা বাড়িতে থাকতেন। আর হরিণ বাড়ি বলতে শরৎচন্দ্র জেলখানা বোঝাতে চেয়েছেন। প্রাচীন কলকাতায় গড়ের মাঠের বর্তমান রেস-কোর্সের পূর্বদিকে কোনও এক জায়গায় হরিণবাড়ি নামে একটি 'জেলখানা' ছিল।

শরৎচন্দ্রের ঐ কথায় রসিকতা প্রকাশ পেলেও বাস্তব একটা দিক তিনি তুলে ধরেছিলেন। অর্থাৎ কিনা সুভাষের সঙ্গ নিলেই জেলের ভয়—সে কথাটাই তিনি দিলীপ রায়কে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

দিলীপবাবু কিন্তু হরিণবাড়ির ভয়ে সেইদিনই আর মামাবাড়ি রওনা হননি।

তারপরই তাঁরা তিন বন্ধু, অর্থাৎ শরৎ-সুভাষ-দিলীপ, রাজনৈতিক নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

সুভাষচন্দ্র, দিলীপকুমার রায়, কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা একদিন এক ঘরোয়া সভায় বসে হাল্কা আলোচনায় ব্যস্ত। নানাজন নানাকথা বলে চলেছেন। আলোচ্য বিষয় কখনও ব্যক্তিগত, কখনও বা রাজনৈতিক।

হঠাৎ দিলীপবাবু বন্ধু সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন: সুভাষ, তোমার শরীর দেখছি এখনও দুর্বল। আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিলে ভাল হয় না? বিশেষতঃ ডাক্তার যখন বলেছেন।

চিন্তিত সুভাষচন্দ্র উত্তরে বললেন: সবই বুঝি। কিন্তু উপায় কি ভাই, কংগ্রেসের কাজে সেরকম লোক আর পাচ্ছি কই? বলেই সুভাষচন্দ্র একটু থামলেন। তারপর চাপা হাসি হেসে শরৎচন্দ্রের দিকে তাকালেন। এবং বললেন: তবে হ্যাঁ, শরৎবাবু যদি বাংলা কংগ্রেসের দায়িত্ব নিতে রাজি হন তো আমি একটু বিশ্রাম নিতে পারি।

সুভাষচন্দ্রের কথা শুনে শরৎচন্দ্র হাসলেন। বললেন : দেখো সুভাষ, দেখতে আমি বোকা বটে, আসলে আদৌ বোকা নই। ভেবেছো, প্রদেশ কংগ্রেসের গদ্দিতে বসিয়ে তোমার বদলে আমাকে জেলে পাঠাবে ? আরে তাতে কি আর আমি রাজি হই !

সুভাষচন্দ্র হেসে বলে উঠলেন : আপনার মত খ্যাতিমান সাহিত্যিককে কেউ ধরবে না। সুতরাং আপনার জেলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই শরৎবাবু !

সুভাষচন্দ্রের সব কথা শেষ হওয়ার আগেই শরৎচন্দ্র বলতে শুরু করলেন : আরে ভাই, তুমি তো বলেই খালাস। হাতকড়া দিয়ে পুলিশ যখন নিয়ে যাবে, তুমি দলবল নিয়ে এসে তখন বড়জোর গলায় একগাছি ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' আর 'শরৎ-বাবু কি জয়' ধ্বনি তুলবে। তোমার সুধামুখের ঐ ধ্বনি শোনবার জন্য, আর একগাছি মালা পরার আশায় আমি পাঁচপাঁচটি বছর জেল খাটতে আদৌ রাজি নই বাপু !

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সুভাষচন্দ্র তো বটেই, ঘরসুদ্ধ আর সকলেও হেসে উঠলেন।

তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। কাতারে কাতারে মানুষ আইন অমান্য করে জেলে যাচ্ছে। শরৎচন্দ্র স্বয়ং তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।

সুভাষচন্দ্র শরৎবাবুকে বললেন : শরৎবাবু, আপনাকে একবার জেলে যেতে হবে।

গম্ভীরভাবে শরৎচন্দ্র উত্তর করলেন : আমারও তো খুব ইচ্ছে একবারটি জেলে যাই। কিন্তু মুস্কিল কি জানো সুভাষ, সেখানে যে কেউ আফিং দেবে না ! আফিং ছাড়া যে আমি বাঁচবো না।

সুভাষচন্দ্র : বেশতো সে জন্য আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আফিং-এর ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।

শরৎচন্দ্র বললেন : তুমি যে আমার সঙ্গে সঙ্গেই জেলে থাকবে,

তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে ভাই? তুমি জেল থেকে আগে বেরিয়ে গেলে আমার কি অবস্থাটা হবে? না, ওতে সুবিধে হবে না হে। দেখতো, শক্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এক ঐ আফিং-এর জন্যই আমার জেলে যাওয়া হচ্ছে না—বুঝলে সুভাষ। তার জন্যে দুঃখটা কি আমারও কম?

শরৎচন্দ্রের কথায় সুভাষচন্দ্র হেসে উঠলেন। আর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না।

জেল প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের আরও সব মন্তব্য নানা সময় প্রকাশ পেয়েছে। সরস সেইসব মন্তব্য বন্ধুবান্ধবদের প্রায়ই হাসির খোরাক জোটাতো।

শরৎচন্দ্র একদিন দেশবন্ধুকেও বলেছিলেন: শুনি জেলখানায় নাকি তামাক বা আফিং দেয় না। তাই আমার আর জেলে যাওয়া হলো না। দেখছি, জেলখানাটা ঠিক ভদ্রলোকের জায়গা নয়।...

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একসময় নিয়মিতভাবে আফিং ভরতি কৌটো থাকতো। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে গিয়ে একদিন তিনি সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে গল্প-সল্প করছিলেন। তাদের কাছে কথায় কথায় তিনি আফিং খাওয়ার গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেন: একটু আফিং খেলেই দেখবে মগজ কেমন খুলে যাবে, এবং আমার মত সাহিত্যিক হতে পারবে।

আফিং-এর মহিমা প্রচার করে এবং নানা কথায় ভুলিয়ে তিনি সকলকেই কিছু না কিছু আফিং খাওয়ালেন। এবং বলাবাহুল্য, আফিং খেয়ে সকলেই কমবেশি নেশাগ্রস্থ হলেন।

শরৎচন্দ্র তখন রসিকতা করে একটি চিরকুটে লিখলেন: আফিং-এর মোহে আকৃষ্ট হয়ে আপনার অফিসের কর্মীরা আমার মত সাহিত্যিক হওয়ার লোভে আফিং খেয়েছে। এবং বলতে কি, তারা জোর করেই তা খেয়ে নিয়েছে। এখন তারা সবাই

নেশার ঘোরে ঝিমুচ্ছে। অবিলম্বে নেশা কাটানোর জন্য কিছু মিষ্টি পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আপনার অফিসের এতগুলি কর্মী আফিং খেয়ে নেশাগ্রস্থ হয়েছে জানতে পারলে পুলিশ আপনাদের হাতকড়া পড়াবে। সুতরাং পত্রপাঠ যোগ্য ব্যবস্থা নিন।

শরৎচন্দ্রের লেখা চিরকূটখানি নিয়ে দারওয়ান মালিকের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে দিলো। শরৎচন্দ্রের রসিকতা এবং মানসিকতা তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতেন। সুতরাং ঐ চিরকূট পাওয়ার পরই তিনি কিছু টাকা শরৎবাবুর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

টাকা পেয়ে শরৎচন্দ্রের সে কী আনন্দ। তিনি অফিসের সকল কর্মচারীদের ডাকলেন। তারপর মিষ্টি আনিয়ে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। কর্মচারীরাও কথাশিল্পীর পাশে বসে 'মিষ্টি ভোজ' শুরু করলেন। আর একের পর এক হাস্য-পরিহাস সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র কর্মীদের মাতিয়ে তুললেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রায় শেষ দিকের কথা। তখন তিনি দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন। বিকেলের দিকে প্রায় প্রতিদিনই একটু বেড়াতে বেরোন। সেদিন রাসবিহারী এভিনিউ ধরে একা একাই পথ চলছিলেন। হঠাৎ তাঁর এক সাহিত্য-রসিক বাল্যবন্ধুকে দেখতে পেলেন।

সুদীর্ঘকাল পরে বন্ধুকে পেয়ে আনন্দে তার কাছাকাছি গিয়ে অভিযোগ করেন: কীহে, আমাকে চিনতেই পারছো না? আমি যে তোমাদের সেই শরৎচন্দ্র।

ঐ সময় শরৎচন্দ্র নামে আরও একজন সাহিত্যিকের বাংলা দেশে আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পুরো নামও ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'গল্পলহরী' নামে একখানি সাময়িক পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করতেন। 'হীরের ফুল', 'চাঁদমুখ' ইত্যাদি নামে তিনি কয়েকখানা বইও লিখেছিলেন।

সুতরাং শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু একটু রসিকতা করেই শরৎচন্দ্রকে

না চেনার ভান করলেন। তারপর কৃত্রিম-কৌতূহল প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলেন : বাংলার সাহিত্যাকাশে তো এখন দু'জন শরৎ-চন্দ্র। আপনি কোনজন ঠিক বুঝতে পারছি না !

শরৎচন্দ্র বন্ধুটির পরিহাস ধরে ফেললেন। তারপর হেসে জবাব দিলেন : আরে আমি যে সেই "চরিত্রহীন" শরৎচন্দ্র ! বুঝতে পারলে চরিত্রহীন···

শরৎচন্দ্রের সরস উত্তরে তাঁর বাল্যবন্ধু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

দেশবন্ধুর সঙ্গে : ঘরে-বাইরে

১৯১৭ সাল।

ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান কবি। তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যিক-প্রীতি সর্বজনজ্ঞাত। চিত্তরঞ্জন একটি পত্রিকার সম্পাদকও। পত্রিকার নাম 'নারায়ণ'। সেই সূত্রে কবি-সাংবাদিক চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পরিচয়। চিত্তরঞ্জন তাঁর পত্রিকার জন্য শরৎচন্দ্রের একটি গল্প চেয়ে পাঠালেন। শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তরে সাড়া দিলেন। গল্প পাঠালেন। কিন্তু তার নামকরণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন সম্পাদকের ওপর। সম্পাদক চিত্তরঞ্জন গল্পের নাম দিলেন 'স্বামী'—এবং তা বাংলা ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যার 'নারায়ণে' যথারীতি প্রকাশ করলেন।

গল্প প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তরঞ্জন সম্মান-দক্ষিণাস্বরূপ তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত একটি সাদা চেক শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে অনুরোধ-পত্র : চেকে আপনার ইচ্ছামত টাকার অঙ্ক বসিয়ে নেবেন। অর্থ দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টির মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব। তাই আমি নিজে আর টাকার অঙ্ক বসালাম না।

সম্পাদকের পাঠানো চেক এবং চিঠি পেয়ে কথাশিল্পী বিস্ময়ে হতবাক। গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় তিনি চিত্তরঞ্জনের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হলেন। ছোট অথচ অসামান্য ঐ ঘটনার মধ্য দিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হলো।

১৯২১ সাল।

মহাত্মা গান্ধীর ডাকে তখন সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। জাতীয় কংগ্রেস বিদেশী শাসনের সঙ্গে পূর্ণ এবং প্রকাশ্য অসহযোগিতা ঘোষণা করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে আসমুদ্র হিমাচল উত্তাল। বিদেশী রাজশক্তি পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তি-আন্দোলনের ব্যাপকতায় বিচলিত। কিন্তু তবুও মদমত্ত রাজশক্তি তার নগ্ন রূপ প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না। দেশনেতা আর স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। প্রতিবাদ আরও তীব্র হলো। মহাত্মা গান্ধী পুনর্বার ঘোষণা করলেন : বিদেশী শাসকের অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিংসা নয়। অহিংসা এবং অসহযোগিতার মধ্য দিয়েই তাঁদের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। প্রদেশে প্রদেশে গড়ে তোলা হোক দুর্বার আন্দোলন।···

এর মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ সুপ্রতিষ্ঠিত। সর্বত্যাগী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' হিসাবে পূজ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর প্রভাব ও প্রাধান্য অপরিসীম। গান্ধীজীর আহ্বানে দেশবন্ধু বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ঐ মহান দায়িত্ব নিয়ে তিনি বঙ্গবাসীর কাছে রাজনৈতিক সহযোগিতার জন্য আবেদন রাখলেন। স্বদেশের সেবায় দেশবন্ধুর যথাসর্বস্ব ত্যাগের কাহিনী তখন দেশের সর্বত্র প্রচলিত। মুক্তিকামী শত-সহস্র মানুষ সগর্বে এবং স্বেচ্ছায় দেশবন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

আইন-অমান্য, অসহযোগের ঢেউয়ে বাংলার মাটি তখন প্লাবিত। দেশবন্ধুর সঙ্গে আগে থেকেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সখ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সুযোগে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন দেশবন্ধুর কাছে, দেশসেবায় আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প নিয়ে।

দেশবন্ধু কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মতো একজন প্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিককে রাজনৈতিক সহকর্মীরূপে পেয়ে সানন্দে গ্রহণ করলেন। তারপর থেকেই শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর অনুগামী, সহকর্মী। এইভাবেই শরৎচন্দ্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন, এবং ক্রমে ক্রমে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করেন।

রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বসবাস শুরু করেন। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে শরৎচন্দ্রের নাম তখন সাহিত্যিক হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর নিত্যনতুন রচনা দেশবাসীর আলোচ্য বিষয়। সুতরাং সেই সময়ে রাজনীতিতে তাঁর অনুপ্রবেশে সাধারণ মানুষ আনন্দিত হলেও, বন্ধুবান্ধব অনেকেই শরৎচন্দ্রের সমালোচনায় মুখর হন। বন্ধুরা তাঁকে রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁদের সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন: রাজনীতির আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীরই অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি। বিশেষতঃ আমাদের দেশ হলো পরাধীন দেশ। এদেশের রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন, মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাহিত্যিকদেরই তো সর্বাগ্রে এসে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ, জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মুক্তির আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই।...

দেশবন্ধু বোধহয় শরৎচন্দ্রের স্বদেশচিন্তায় আগে থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের লেখা ছাড়াও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মানসিকতার উত্তাপ

দেশবন্ধুর কাছে আগেই ধরা পড়েছিল। তাই তিনি শরৎচন্দ্রকে হাওড়া জেলার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করলেন। এবং তাঁর ওপর ঐ জেলার সংগঠনের পূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিলেন।

ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো। সে সংবাদ সারাদেশে বেদনা ও ক্ষোভের ঘূর্ণি ঝড় তুলল। কারারুদ্ধ দেশনেতার মুক্তির দাবিতে দেশজোড়া সভা-সমিতি ও নানা আন্দোলন শুরু হলো।

দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকা তখন মুক্তিকামী মানুষের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। শরৎচন্দ্র সেই সময় দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'মহাত্মাজী' নামে এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখলেন: দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন। মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই। এমন করিয়া চাহিয়াছেন, যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়।...

...এমন কাড়াকাড়ির দেওয়া-নেওয়া তো সংসারে অনেক হইয়া গেছে। কিন্তু সে তো স্থায়ী হইতে পারে নাই, দুঃখ-কষ্ট-বেদনার ভার তো কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কোথাও তো একটি তিলও কম পড়ে নাই। তাই তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন।...

তাই দুঃখ দিয়া নহে দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে আপনাকে অকুণ্ঠচিত্তে বলি দিতেই এই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিলো তাঁহার তপস্যা। ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতাকলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সাধনা গুলি-গোলা, বন্দুক-বারুদ-কামানের মধ্যে নাই। আছে কেবল মানবপ্রীতির মধ্যে, তাঁহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে।...

মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারামারি, কাটাকাটি, অস্ত্রশস্ত্র, বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই। তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন, অভিযোগ-অনুযোগ এই আত্মার

কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে, কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণ পণ করিয়াছিলেন।...

শরৎচন্দ্রের ঐ ঐতিহাসিক রচনা দেশবাসীর ক্ষোভের জ্বালায় নতুন করে ঘৃতাহুতি দিল। তাঁর রচিত 'মহাত্মাজী' নিবন্ধ রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ফলে রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর আসন আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

গান্ধীজীর মতো তিনি দেশবন্ধুকেও শ্রদ্ধা করতেন। দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত একজন সৈনিকরূপেই শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কর্মধারা বিস্তৃত করেন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য সুভাষচন্দ্রও ছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের মুখে একসময় দেশবন্ধুও কারারুদ্ধ হন। তখন তিনি অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে গোপনে দেশবন্ধুর নির্দেশিত এবং পরিকল্পিত পথে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। তার প্রায় একবছর পর, ১৯২২ সালের জুন মাসে, দেশবন্ধু মুক্ত হলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবন্ধুর সম্বর্ধনার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে এক প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন করা হয়। পুলিশের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে শরৎচন্দ্র সেদিন অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে ঐ সভার উদ্যোগ-আয়োজন করেন। সেই ঐতিহাসিক সভায় দেশবন্ধুর উদ্দেশে যে 'অভিনন্দনপত্র' পাঠ করা করা হয়—শরৎচন্দ্র নিজেই সেই পত্রটি রচনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র নিজে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে দেশসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং স্বদেশের সেবার কাজের নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার অভাব দেখলে তিনি নীরবে কখনও তা সহ্য করতে পারতেন না। রাজনীতিতে তিনি ভাবাবেগের প্রাবল্যও খুব একটা পছন্দ করতেন না। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সারাদেশে প্রচুর লোক

ধরপাকড় করা হলো। নেতাদের সঙ্গে হাজার হাজার সাধারণ মানুষও কারারুদ্ধ। সেই চরম মুহূর্তে আবেগের বশে অনেকেই জেলে গেলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একশ্রেণীর কর্মী আবার কষ্ট স্বীকারের ভয়ে সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে জেল থেকে ফিরে এলেন। সে-চিত্র নিষ্ঠাবান শরৎচন্দ্রকে ভীষণভাবে মানসিক পীড়া দেয়। দেশবন্ধুকে ঐ প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন: অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা তো গণসাধারণ অর্থাৎ 'মাস'-এর জন্য? কিন্তু ঐ 'মাস' পদার্থটির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই। এক-দিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতেও পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সেবার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিলো। কিন্তু দলে দলে ফিরেও এসেছিলো। যারা আসেনি তারা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা।

১৯২২ সালের জুলাই মাস শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের একটা স্মরণীয় কাল। যে শরৎচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের মুক্তির জন্য নীরবে কাজ করে চলছিলেন, হাওড়া জেলার কংগ্রেস সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সুপরিকল্পিত আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, হঠাৎ তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। ঐ উপলক্ষে ১৪ই জুলাই এক কর্মী-সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন: কাজ করবো না, মূল্য দেবো না অথচ পাবো, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারাই যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই বলছি আমি, কেবলমাত্র সমস্বরে ও প্রবলকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ও মহাত্মাজীর জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না।

শরৎচন্দ্রের সেই পদত্যাগপত্র পেয়ে দেশবন্ধু খুবই বিচলিত হলেন। দেশবন্ধু তাঁকে তাঁর পদত্যাগ-প্রসঙ্গ বিবেচনা করতে অনুরোধ করলেন। এবং পরে পুনরায় তাঁকে ঐ পদে বসালেন। তারপর অবশ্য শরৎচন্দ্র একাদিক্রমে প্রায় দশ বছর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে ছিলেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ১৯২২ সালে বিহারের গয়ায় বসল। ঐ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সভাপতিত্ব করার জন্য গয়া অধিবেশনে যখন দেশবন্ধু যান, তখন তাঁর সাথী ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুর সঙ্গে অন্যান্য সর্বভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তায় মতভেদ দেখা দেয়। সভাপতিরূপে দেশবন্ধু মনে করেন, অসহযোগীদের আইনসভায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। আইনসভায় ঢুকে অসহযোগীদের কাজ হবে প্রতিপদে বিদেশী শাসকদের অন্যায়-অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তাদের নগ্নরূপকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা।

রাজা গোপাল আচারী সহ সর্বভারতীয় অন্য সব তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা অবশ্য দেশবন্ধুর যুক্তি মেনে নিতে চাইলেন না। রাজা গোপাল আচারীর নেতৃত্বে অধিকাংশ সদস্য দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নে তীব্র মতভেদ দেখা দেওয়ায় দেশবন্ধু স্বেচ্ছায় কংগ্রেস-সভাপতি পদে ইস্তফা দিলেন। তারপর ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই 'স্বরাজ্য দল' নাম দিয়ে একটি ভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করলেন। ফলে সারাভারতের রাজনীতিতে এক চাঞ্চল্য ও কৌতূহল দেখা দিল। স্বরাজ্য দল ও তাঁর প্রতিষ্ঠাতা দেশবন্ধুর পাশে সেদিন মাত্র কয়েকজন নেতা ও কর্মী। সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে যে ক'জন দেশবন্ধুর যুক্তি ও বক্তব্য সমর্থন করে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন, লালা লাজপত রায়, বিঠলভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁদের অন্যতম। বলাবাহুল্য ঐ সূত্রে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রায় সকল সর্বভারতীয় নেতার সঙ্গেই পরিচিত হন।

দেশে সে এক অভাবিত পরিস্থিতি। দেশবন্ধুর নতুন দল গড়া নিয়ে কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা। স্বরাজ্য দল, দেশবন্ধু এবং তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে চারিদিকে রাজনৈতিক জেহাদ। কংগ্রেসের বৃহত্তম অংশ সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে দেশবন্ধুর

বিরোধিতায় প্রকাশ্যে মুখর। সারাদেশের নেতৃবৃন্দ এবং ছোট-বড় সকল শ্রেণীর সংবাদপত্র দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে কুৎসা আর কল্পিত কাহিনী প্রচার করে তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র হনন করতে সচেষ্ট। দেশবন্ধুর দেশসেবার সে কী অভাবিত পুরস্কার!

শরৎচন্দ্র গয়াকংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুনেছিলেন দেশবন্ধুর আবেগময় অভিভাষণ, আর যুক্তি। এবং পরবর্তী ধাপে স্বরাজ্য দল সংগঠনের সময়ও তিনি দেশবন্ধুর পাশে পাশেই ছিলেন। তাই দেশজোড়া যখন দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার-অভিযান, সেই চরম মুহূর্তে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর একজন আদর্শ সেনা আর রাজনৈতিক সহচরের মতোই তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। দেশবন্ধুর উদ্দেশে সেদিন যে কুৎসা, অপপ্রচার ও নিন্দার ধ্বনি উঠেছিল, শরৎচন্দ্রও তাতে কম ব্যথা পাননি। ক্ষুব্ধ এবং বেদনাহত শরৎচন্দ্র সেদিন দেশবন্ধুর অসহায় অবস্থায় বর্ণনা দিয়ে লেখেন :…গয়া-কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাংলাদেশে ইংরাজি-বাংলা যতোগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তবগান শুরু করিয়া দিলো। তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ হয় তাহার আর তুলনা নাই।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা, তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না। দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম। শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে, কি দশটা হইবে। বাহিরে জল পড়িতেছে। আর আমি, সুভাষ ও তিনি (দেশবন্ধু) শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি—কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম : গরজ কি একা আপনারই?

দেশের লোক সাহায্য করিতে যদি এতটাই বিমুখ হইয়া ওঠে তো তবে থাক।

মন্তব্য শুনিয়া বোধহয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন—এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই। আমরাই কাজ করিতে জানিনা। আমরাই তাহাদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। বাঙালী ভাবুকের জাত, বাঙালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝিবে, তাহার যথাসর্বস্ব আনিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিবে।...

গয়া-কংগ্রেসে রাজনৈতিক পরাজয় এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রের প্রচারের কাছে দেশবন্ধু কিন্তু নতি স্বীকার করলেন না। তিনি নিজে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সভার পর সভা। দেশবাসীকে তিনি বোঝাতে লাগলেন: আইনসভায় প্রবেশ করে বিদেশী সরকারের অন্যায়-মূলক নানা কাজে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের নগ্নরূপ জনগণের কাছে তুলে ধরতে সুবিধা হবে। তাতে দেশের সাধারণ মানুষ বিদেশী সরকারের আসল চেহারাটা ধরতে পারবে। ভেতরের এবং বাইরের এই সহযোগিতা এবং অসহযোগিতার মধ্য দিয়েই দেশবাসীকে আরও জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে, স্বরাজের কাজ তাতে তরান্বিতই হবে।

দেশবন্ধুর বক্তব্যে এবার রাজনীতির বরফ গলতে লাগল। প্রথমশ্রেণীর যে সকল নেতা গয়া অধিবেশনে দেশবন্ধুর বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁরাও দেশবন্ধুর যুক্তির সমর্থনে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

ক্রমে দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হলো। সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে, ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হলো। ঐ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন আবুল কালাম আজাদ। ঐতিহাসিক দিল্লী অধিবেশনেও সেদিন দেশবন্ধুর সঙ্গী ছিলেন শরৎচন্দ্র। আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে অধিবেশন বসবে। রাজ-

নৈতিক আসরে দারুণ কৌতূহল। কেননা, গয়াকংগ্রেসের পরই ঐ বিশেষ অধিবেশন।

ওদিকে গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুর প্রস্তাবের বিরোধিতায় যিনি মুখ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই রাজা গোপাল আচারী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর কাছে গেলেন তিনি গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুর আইনসভায় প্রবেশ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর নির্দেশ চাইলেন।

গান্ধীজী বললেন: প্রয়োজন বোধ করলে অসহযোগকারীদের দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আইনসভায় প্রবেশ করায় কোন বাধা থাকতে পারে না।

গান্ধীজীর ঐ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশে ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সুচনা হলো। রাজা গোপাল আচারী ও তাঁর সমথকরা বুঝলেন, গয়া-অধিবেশনে দেশবন্ধু যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, দেশের মঙ্গলের জন্য তার সমর্থন প্রয়োজন। দিল্লী-কংগ্রেসে বিনাবাধায় প্রয়োজনে আইনসভায় প্রবেশের সপক্ষে এক প্রস্তাব গৃহীত হলো। দিল্লী-কংগ্রেসের ঐ প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় রাজ নীতিতে দেশবন্ধুর এক বিরাট জয় সুচিত হলো।

দেশবন্ধুর সঙ্গে দিল্লী-অধিবেশনে উপস্থিত থেকে শরৎচন্দ্র ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সহ সর্বভারতীয় বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে আসেন। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্ব দিল্লী-কংগ্রেসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা শরৎচন্দ্রকেও বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। দিল্লী-অধিবেশন থেকে ফিরে 'দিন কয়েকের ভ্রমণকাহিনী' শীর্ষক রচনায় তিনি লেখেন: এই ভারতবর্ষের এত দেশ এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এতবড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ-করা জীবন আর কই? অনেকদিন পূর্বে তাঁহারই একজন ভক্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করা প্রায় তুল্য কথা। কথাটি যে কতবড় সত্য, এই সভায় (দিল্লী অধিবেশন) একান্তে বসিয়া আমার বহুবারই তাহা মনে পড়িয়াছে।

১৯২৪ সাল।

বরিশালে সেবছর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন। সদলবলে দেশবন্ধু সেই অধিবেশনে যোগ দিতে গেলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং সম্পাদক ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রদেশ কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই দেশবন্ধুর বিরোধী। স্বরাজ্য দল গঠন করা নিয়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে তখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পুরোমাত্রায় বর্তমান। সুতরাং ঐ অধিবেশনে দেশবন্ধু ও তাঁর অনুগামীদের উপস্থিতি কর্মকর্তারা কেউই খোলামনে গ্রহণ করতে পারেননি।

অধিবেশন শুরু হলো। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কেউই দেশবন্ধুকে মঞ্চে নেতৃবৃন্দের আসনে বসতে পর্যন্ত অনুরোধ করলেন না। ঐ চিত্র উপস্থিত সকলকে স্তম্ভিত করল। একে অপরের দিকে চোখ রাখেন। সর্বভারতীয় নেতা দেশবন্ধুর প্রতি ঐ ধরনের আচরণে সাধারণ সদস্যরা স্তম্ভিত হন।

ওদিকে সভার কাজ শুরু হয়েছে। সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর একটা নির্দেশ নিয়ে কিছু বাকবিতণ্ডা চলেছে। দেশবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন বলতে গেলেন। সভাপতি তা দেখেই নাটকীয় ভঙ্গীতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিরক্তির সুরে বললেন : I won't hear that man.

সভাপতির কথা শুনে দেশবন্ধু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে তখন অভিমানের ছাপ। শান্ত সমাহিত দেশবন্ধু ধীর কণ্ঠে বললেন : শ্যামসুন্দরবাবু, আমি অনেকদিন ব্যারিস্টারি করেছি। কখনও হাইকোর্টের কোন বিচারপতি পর্যন্ত আমাকে বলতে পারেননি, তিনি আমার কথা শুনবেন না। আর আজ আপনি আমাকে তাই বললেন ?

শরৎচন্দ্র এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন এরপর তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বললেন: দেশবন্ধুকে আপনি 'That man' বললেন, 'That gentle man' পর্যন্ত বলতে পারলেন না?

সভাপতির আসন থেকে শ্যামসুন্দরবাবু এবার উত্তেজিত কণ্ঠে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে বললেন: I can't stand your face.

অধিবেশনে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। সে এক অরাজক অবস্থা। শরৎচন্দ্র ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি আর এক মুহূর্তও অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেন না। উত্তেজিত শরৎচন্দ্র ক্ষোভ, ঘৃণা আর লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে অধিবেশন ছেড়ে চলে গেলেন।

দেশবন্ধু ততক্ষণে দলবল নিয়ে প্রতিনিধি-শিবিরে ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আলিপুর বোমার মামলার আসামী বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশবন্ধু বুঝলেন, শরৎচন্দ্র তখনও উত্তেজিত। শরৎচন্দ্র কিন্তু দেশবন্ধুকে একটি কথাও বললেন না। ছুটে বিপ্লবী উপেনবাবুর কাছে গিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন: উপীন, আমাকে একটা বোমা তৈরি করে দিতে পারো? তুমি তো বোমারু দলের নেতা ছিলে!

দেশবন্ধু ও উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের ঐ অস্থিরতায় হতবাক। উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কেন, কী হয়েছে—বোমা দিয়ে কি করবেন?

শরৎচন্দ্র বললেন: ঐ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে মারবো। উনি বলেন কিনা···

শরৎচন্দ্রের কথায় সকলে হেসে উঠলেন। অতি দুঃখে দেশবন্ধুও হেসে ফেললেন। শরৎচন্দ্র তা দেখে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন: দেশবন্ধু, আপনিও হাসছেন? প্রকাশ্য সভায় এমনভাবে অপমান···তারপরও আপনার মুখে হাসি আসছে? তিক্তকণ্ঠে শরৎচন্দ্র এবার বলেন: যে-রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমনভাবে অপমানিত হতে হয়—

তাতে আর আমি নেই। I have had enough of it and I would have none of it any more.

অসীম ভালোবাসায় দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের হাত তুটি চেপে ধরে বললেন : তাই করুন শরৎবাবু! আপনি সাহিত্যিক, শিল্পীমানুষ। আপনার অনুভূতি বড় 'ডেলিকেট'। এত ব্যথা আর' অপমান আপনার সহ্য হবে না। এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে দিন।

শরৎচন্দ্র এরপর কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন : আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারদিকে এই বাধা-বিদ্রূপের বেড়াজাল, এরমধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কীভাবে!

রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশবন্ধু যখন যেখানে যেতেন শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিতেন। এবং ঐসব যাত্রাপথে সুযোগ-সুবিধা পেলেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তুজন আলাপ-আলোচনা, শলাপরামর্শ করতেন। শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন বলেই বোধহয় তিনি নিঃসঙ্কোচে দেশবন্ধুর কাছে তাঁর মনের কথা সব খুলে বলতে পারতেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে সেবার বরিশাল যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সহযাত্রী ছিলেন। নদীপথে তাঁরা ষ্টীমার করে বরিশাল যাচ্ছিলেন। প্রায় সারারাত জেগে তু'জন ষ্টীমারের ডেকে বসে রাজনীতি নিয়ে নানা বিষয় কথাবার্তা বলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্মৃতিকথায়' সেইসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিস্তারিত-ভাবে লিখে রেখেছেন। তারই কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো :

...(দেশবন্ধু) জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করেছেন, সে বিশ্বাস করিনে।

—কেন করেন না?

—বোধহয় অনেকদিন চরকা কেটেছি বলে। দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন: এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের পাঁচ কোটি লোকও যদি সুতো কাটে, তো ষাট কোটি টাকার সুতো হতে পারে।

বলিলাম—পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে একটি বাড়ি তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হতে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস করেন?

দেশবন্ধু বলিলেন—এ দুটো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি, সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি। আমার ভারী ইচ্ছে যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোনরকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম—ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন।

দেশবন্ধু হাসিলেন। বলিলেন—আপনি হিন্দু-মুসলমান ইউনিটি বিশ্বাস করেন?

বলিলাম—না।

দেশবন্ধু কহিলেন—কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে, বলতে পারেন? এরই মধ্যে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে। আর দশ বছর পর কি হবে বলুন তো?

—কেবল সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিস নয়। তা হলে চার কোটি ইংরেজ দেড়শ কোটি মানুষের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারতো না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন। দেশের মধ্যে এদের একটা মর্যাদার স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচার চলে আসছে, তার প্রতিবিধান করুন। ও-দিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।...

প্রশ্ন করিলেন—আপনি আমাদের অহিংস অসহযোগে বিশ্বাস করেন?

বলিলাম—না। অহিংস সহিংস কোন অসহযোগেই আমার

বিশ্বাস নেই।...ইতিমধ্যে যতটুকু শক্তি আপনার কাজ করে দিই।...

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, এই রেভোলিউশনারিদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

—এদের অনেককে আমি যথার্থ ভালবাসি। কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাকটিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা'ছাড়া এর দোষ এই যে স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিস যাবে না। তখন আরও স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠবে। সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি শরৎবাবু।...

দেশবন্ধুর সঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেমন শরৎচন্দ্র আলোচনা করতেন, অনেক সময় আবার স্বভাবসুলভ রসিকতায় তিনি দেশবন্ধুর হাসির খোরাকও জোটাতেন। গুমোট পরিবেশকে হাল্‌কা করে দিতেন।

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে একবার স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। দুই স্বামীজীই গেলেন দেশবন্ধুর কাছে তাঁদের সমস্যার মীমাংসার জন্য। দেশবন্ধুর বাড়িতে বসেও স্বামীজীরা একে অপরের বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করতে লাগলেন। এক সময় দু'জনই এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তাঁদের চীৎকার ও পাল্টা-চীৎকারে দেশবন্ধুও অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন। দুই স্বামীজীর বাদ-প্রতিবাদের ঝড়ে অসহ্য হয়ে দেশবন্ধু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন: আমার প্রাণ যে গেল, শরৎবাবু!

পাশে বসে থাকা শরৎবাবু এতক্ষণ নীরবে সবই লক্ষ্য করছিলেন। দেশবন্ধুর কাতর প্রশ্নে সচকিত হয়ে শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন: প্রাণ তো যাবেই, দেশবন্ধু! দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতলেই মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যায়। আর আপনি কিনা দুই 'স্বামী' নিয়ে ঘরকন্না আরম্ভ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের কথায় দেশবন্ধু তো বটেই, ঘর সুদ্ধ লোক সব উচ্চহাসি হেসে উঠলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে ফরিদপুরে কংগ্রেসের এক অধিবেশন বসল। দেশবন্ধু তার সভাপতি। তদানীন্তন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া, লর্ড বার্কেনহেড জাতীয় কংগ্রেসের কাছে রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। সেই সহযোগিতার প্রশ্নে সারা ভারতে তখন দারুণ বিতর্ক-উত্তেজনা বর্তমান।

ফরিদপুরের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে দেশবন্ধু ঐ সহযোগিতার সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন : কৌশলগত কারণেই ঐ পথে আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। দেশবন্ধুর বক্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভায় প্রতিবাদের ঝড় উঠল। প্রায় সকলেই তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। শুধু তাই নয়— সভায় কেউ কেউ দেশবন্ধুর উদ্দেশে কিছু আপত্তিজনক মন্তব্যও প্রকাশ করলেন।

বিতর্ক ও ঝড়ের মধ্যে অধিবেশন শেষ হলো। হতাশ দেশবন্ধু ভাঙা মনে কলকাতা ফিরলেন। তারপরই চারদিকে বিভ্রান্তিকর প্রচার : দেশবন্ধু গভর্নর হওয়ার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইছেন, ইত্যাদি।

লজ্জা আর ঘৃণা, বেদনা আর ক্ষোভে দেশবন্ধু তখন মর্মাহত। মানসিক যন্ত্রণায় তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। এবং অবশেষে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

দেশবন্ধু অসুস্থ। অভিমান আর হতাশায় ভেঙে পড়া দেশবন্ধুর মুখে শুধু ঐ এক কথা : আমি গভর্নর হতে চাইছি—শেষ পর্যন্ত কিনা···শয্যাপাশে বসে থাকা শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে সান্ত্বনা দেন। এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যের যেন আর কোন উন্নতিই হয় না। দেখতে দেখতে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন।

ক্ষীণকণ্ঠে শরৎচন্দ্রকে বলেন : শরৎবাবু, আমি মডারেট হয়ে গেছি? ওরা বলে, আমি গভর্নর হতে চাই!···শেষ পর্যন্ত এই হলো বাংলাদেশের ধারণা? অভিমানী দেশবন্ধুর দু'চোখে বেদনার জল জমে ওঠে।

শরৎচন্দ্রও নিজের দু'চোখ মুছে নেন। তারপর দেশবন্ধুকে প্রবোধ দিয়ে বলেন : দুঃখ করবেন না দেশবন্ধু! সব দুঃখকে নিজে গ্রহণ করে দেশের ভবিষ্যত প্রায়শ্চিত্তের পথকে বন্ধ করবেন না। এ দুঃখ সঞ্চিত থাকুক সমস্ত দেশের জন্য, সমস্ত জাতির জন্য। মনে করুন, অগ্নিপরীক্ষা তো সীতাকেই দিতে হয়েছিল। এ দুঃখ আপনি নেবেন না। রেখে যান আমাদের সকলের জন্য।

ক্রমে দেশবন্ধুর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। শেষ অবধি সিদ্ধান্ত হয়, চিকিৎসা, বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তাঁকে দার্জিলিং পাঠানো হবে।

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সকলেরই ঐ এক কথা। পূর্ণ বিশ্রাম, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দেশবন্ধুকে দার্জিলিং পাঠানো হোক। দার্জিলিং যাত্রার কথা শুনে দেশবন্ধু সুদীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সহকর্মী শরৎচন্দ্রের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কী যেন বলতে চান। কিন্তু পারেন না। তাঁর দুর্বল কণ্ঠস্বরে স্পষ্টভাবে তা প্রকাশও পায় না। দেশবন্ধুর অভিমানী দৃষ্টি শরৎচন্দ্র বুঝতে পারেন। সজল চোখে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর একটি হাত চেপে ধরে ধীরে ধীরে বলেন : আপনি সর্বত্যাগী, আপনি অভ্রান্ত, আপনি অগ্নি-শুদ্ধ দেশবন্ধু! অপনিই আমাদের নেতা। দেশ আপনারই—Tom, Dick, Harry-র নয়। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। দার্জিলিং থেকে ফিরে আসুন স্বাস্থ্য লাভ করে। সব ঠিক হয়ে যাবে।···

শেয়ালদা স্টেশনে দার্জিলিং মেল দাঁড়িয়ে। স্টেশন-চত্বর লোকে লোকারণ্য। বন্ধু, সহযোদ্ধা, সহকর্মী আর অগণিত অনুগামীর সমবেত ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখর। ঘণ্টি বাজল। সবুজ সঙ্কেত জ্বলে উঠল।

যাত্রা শুরু হবে। ক্ষীণ কণ্ঠে দেশবন্ধুর আবার আক্ষেপ ঃ ওরা আমার suggestionটা seriously চিন্তা পর্যন্ত করল না।

গাড়ি ছাড়ল। যাত্রা শুরু। আবার জয়ধ্বনি। দেশবন্ধুর কুশল কামনায় সমবেত প্রার্থনা। অনেকের মতো সজল চোখে শরৎচন্দ্রও রুদ্ধবাক্।

মাত্র ক'দিনের ব্যবধান। ১৬ই জুন, ১৯২৫। খবর এল দেশবন্ধু আর নেই।

দেশবাসীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাজনৈতিক গুরুকে হারিয়ে তিনি অস্থিরচিত্ত। দুঃখে-শোকে, অভিমান-আক্ষেপে তিনি বললেন ঃ ···আমরাই শেষ করলুম তাঁকে। এত মার কি সহ্য হয়?···বেশ করেছেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন। সেদিন তো তাঁর সঙ্গে আমরা কাঁদিনি। হাত ধরে বলিনি তো তাঁকে—আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো! আমরা তোমাকে চাই ···আমরা শুধু তোমারই। তাঁকে আমরা কাঁদিয়েছি, তিনি আমাদের কাঁদালেন। বেশ করেছেন···We didn't deserve him. বলতে বলতে শরৎচন্দ্র চোখের জল মুছলেন।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক দীক্ষা হয় মূলতঃ দেশবন্ধুর কাছে। সেই থেকেই তিনি দেশবন্ধুর সর্বক্ষণের রাজনৈতিক সঙ্গী, সহকর্মী। বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের প্রায় প্রতি প্রান্তে জাতীয় কংগ্রেসের নানা কাজে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একদা সদস্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেশবন্ধু দেশের নানা সমস্যা, মত ও পথ নিয়ে একান্তে পরামর্শ ও আলোচনা করেছেন। দিল্লী, লাহোর, গয়া, যখন যেখানে রাজনৈতিক অধিবেশন, সেখানেই শরৎচন্দ্র। তাই দেশবন্ধুকে হারিয়ে তিনি সর্বহারার মতো অসহায় হলেন। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন ঃ আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই। তাই থাকিয়া থাকিয়া

মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদর্শই কি আমাদের মনঃপুত হইত? হায়রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে।...

শিক্ষার বিরোধ, প্রতিকার ও অসহযোগ

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসেছে। সভাপতি লালা লাজপত রায়। অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হল: সরকারী-বেসরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন করা হোক।

সারা দেশে অভূতপূর্ব সাড়া জাগল। অসহযোগের অঙ্গ হিসাবে বিদেশী ভাবধারার শিক্ষা বর্জনের প্রস্তাবকে দেশবাসী স্বাগত জানাল। ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে এল। দেশের বিপুল সংখ্যক তরুণ ছাত্র জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিল।

স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের বার করে আনার উদ্যোগে কিছু কিছু বাধাও পড়ল। এ নিয়ে দেশবন্ধু ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে তীব্র মতান্তর দেখা দিল। আশুতোষ অভিভাবকদের বোঝাতে চাইলেন: ছাত্রদের শিক্ষা বর্জন করিয়ে তা দিয়ে দেশের কোন লাভ হবে না। বরং দেশের শিক্ষাধারা ব্যাহত হবে এবং তার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশেরই ক্ষতি হবে। দেশবন্ধুও আশুতোষের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। একের পর এক জনসভা করে তিনি ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন: Education may wait, but Swaraj cannot. তোমরা সবাই গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসো।...

দেশবন্ধুর আহ্বানে স্কুল-কলেজ ছেড়ে কাতারে কাতারে ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে পড়ল। দেশে এক নতুন প্রাণের জোয়ার

এল। স্যার আশুতোষ ব্যর্থ হলেন। এবার রবীন্দ্রনাথও দেশবন্ধুর ঐ আহ্বানের প্রতিবাদ জানালেন। একটি সংবাদপত্রে পরপর তিনখানি পত্র লিখে কবি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন: অসহযোগের দ্বারা ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চীনের প্রাচীরের মত ব্যবধান রচনা করা হচ্ছে। দেশের সার্থে এটা অনুচিত।

এ নিয়ে দেশে দারুণ প্রতিবাদের ঝড় উঠল। একদিকে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থকদল, অন্যপক্ষে স্যার আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলার দুই দিকপাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে দেশবন্ধুরই জয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র ঐ সময় দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। অসহযোগ আন্দোলন ও ছাত্রদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সভা-সমিতি এবং লেখনীর মাধ্যমে তিনিও প্রচার শুরু করলেন। কবির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তাঁদের মতপার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল।

১৯২১ সালের ১লা জুন তারিখের Young Indiaতে মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। তিনি লিখলেন:

The Poet's concern is largely about the students. He is of opinion that they should have not been called upon to give up Government Schools before they had other schools to go to. Here I must differ from him.…

I am firmly of opinion that the Government Schools have unmanned us, rendered us helpless and Godless.

… They have made us what we are intended to become—clerks and interpreters.

অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশকে প্লাবিত করল। দেশ-বন্ধুর নেতৃত্বে সেদিন বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা বিদেশী পণ্য বর্জন করে বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। বর্জন করল তারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ঐ সময় দেশবন্ধু যে দুজন বিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠাবান সহকর্মী তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গীরূপে পেলেন, তাঁরা হলেন সুভাষ-

চন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষার দিনে সুভাষ-চন্দ্র ও শরৎচন্দ্র ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে শহর গ্রামে, হাটে ও গঞ্জের বক্তৃতামঞ্চে ঘুরতে লাগলেন।

ছাত্ররা বিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। সরকারী, আধা-সরকারী বিদ্যালয় সব বন্ধ। বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা বর্জনের পর কংগ্রেসের নেতারা ভাবলেন, জাতীয় ভাবধারায় ছাত্রদের গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে) 'ফরবেস ম্যানসনে' দেশবন্ধুর নেতৃত্বে 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলো। আর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঐ বাড়িতেই 'কলকাতা বিদ্যামন্দির' নামে একটি মহাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হলো। ঐ মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বাংলাভাষার প্রধান অধ্যাপক পদে নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশবন্ধুর নির্দেশে সুভাষ, শরৎ তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুগামী জাতীয় ভাবধারায় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সেই পর্বে সংগঠক ও শিক্ষক শরৎচন্দ্রের সনিষ্ঠ ভূমিকা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অমূল্য অধ্যায়।

১৯২১ সালে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠাকালে যে বিরাট সভা হয়, সেই সভায় শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ' নামে এক ঐতিহাসিক ভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন: এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব পথে চলে আসছিল। সেটা ভালো কি মন্দ, এবিষয়ে কারও কোনো উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন তা আমিও পড়ব। এর থেকে তিনি যখন দুপয়সা করে গেছেন, সাহেব সুবোর দরবারে চেয়ারে বসতে পেয়েছেন, হ্যাণ্ডশেক করতে পেয়েছেন, তখন আমিই বা কেন না পারবো? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই বনিয়াদ সমেত এমন টলমল করতে লাগলো যে একদল বললেন, পড়ে যাবে। অন্যদল সভায় মাথা নেড়ে বললেন,

না,—ভয় নেই। পড়বে না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তারা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে দিলেন।...মানুষের শক্তি যতো কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে।...

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। পশ্চিম ও পূর্বের শিক্ষার সংঘর্ষ...শিক্ষার প্রণালী নিয়ে এই যে বিবাদ-বিসম্বাদ, এর যথার্থ অন্তরায় কোথায়?...পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু...আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের প্রতি যদি সে শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, তো...লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভালো।...সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গে...আমরা পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ববিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা...। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের এত গভীর।...কিন্তু যে শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে—তা তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না।...এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

...বিদেশী ভাষার মিডিয়ামের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেক্‌চারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না। যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়—যা'তে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মতো, ভিক্ষুকের মতো কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে,—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবে না।

পশ্চিম জয়ী হয়েছে।...কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা—একথা কোনমতেই মেনে নেওয়া

যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিলো, রোমও তাই করেছিলো।…কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি।…সংসারে জয় করা, পরের কেড়ে নেওয়া বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়।… জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই?…হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিলো তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিলো। বিজেতার…কাছে শেখার কিছুই ছিলো না।

…পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী।…সভ্যতার বোধকরি এদের একটিমাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে…বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর ধ্বংস করতে…কত বেশি মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের ঐইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রয়োজন।…তাই… আমাদের এবং আমাদের মতো আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে, এগুলো দেখতে শুনতে মানুষের মতো হলেও, ঠিক মানুষ নয়।…এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে এদের সভ্য করবার, মানুষ করার ভার যখন নিয়েছি, তখন মানুষ এদের করতেই হবে। অত-এব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক।… এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মতো বেশি খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে, তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদের ভালোর জন্যে। আবার টাকাকড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে তাই সে সমস্ত দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি। সে-ও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।…কতো কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে…আমাদের মানুষ করতে এসে এমনি সব ভালো কথার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করছেন তারা।…কিন্তু মানুষ আর…আমরা হলাম না।

একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ

যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই—আর কারও নয়। পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এই-টুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মতো জেলে দিতে ডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট বড়ো পিয়াদা, স্কুলে 'ডুবালের পিতৃভক্তির' গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাষ্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেক্‌চার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, অফিসে খাতা লিখতে জীর্ণশীর্ণ কেরানী—তার শিক্ষাবিধান এর বেশি দিতে পারে না।...

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না।...সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না। এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা।...এই সত্যটা আজ আমাদের...বোঝবার দিন এসেছে।...ঠকিকে মজিয়ে বা কেড়ে-বিকড়ে...নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে।... পরের দেখে আমরাও যেন ঐ ঐশ্বর্যের প্রতি লুব্ধ না হয়ে উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলো; আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজেদের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি, তো সে পরম দুর্ভাগ্য।...ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ঐ যে গোলা-গুলি কামান-বন্দুক...ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।...পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধন-বিজ্ঞান—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে, এ সত্য সে অস্বীকার করবে না।...এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত।

এ ধনী হওয়ার অর্থ···প্রতিবেশীকেও ধনহীন করে তোলা। নইলে শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা ···মহাদেশ যদি ধনী হতেই চায়, তো অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না।···

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে—এই ভুলে।

বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়। শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জ্জন করা নয়। এমনও হতে পারে···এদের বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যা-লাভের বড় পথ।···

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের ঐ অভিভাষণ সেদিন সারা দেশে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের ঐ অভিভাষণে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বদেশের শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে তাঁর ঐ ভাষণ সরাসরি স্যার আশুতোষ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের রাজ-নৈতিক উত্তর বলেও তখনকার দিনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবর হিসেবে পরিবেশিত হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের একটি ধারাকে অব্যাহত রাখতে সংগঠক ও শিক্ষাব্রতীরূপে শরৎচন্দ্র সেদিন যে নিষ্ঠা, ত্যাগ ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

অসহযোগ, অহিংসা ও বিপ্লব

'···বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt.-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন

দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে Class War, বিপ্লবের মাঝে আছে Civil War. আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক্, দেশের শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।...'

শরৎচন্দ্র ১৩৩৬ সালের ১০ই জৈষ্ঠ এক চিঠিতে বিপ্লব ও বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার ঐ কথাগুলো তদানীন্তন 'বেণু' সম্পাদক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লেখেন। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য কি তবে তিনি বিপ্লবকে অপাংক্তেয় মনে করেছিলেন? এবং বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার স্বপ্ন দেখেছিলেন? তাঁর ঐ চিঠির ভাষা থেকে অন্ততঃ তাই মনে হয়।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে একসময় তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে: কংগ্রেসের নেতৃত্বে থেকেও তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের যতটা সম্পর্ক, সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগসূত্র তারচেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই কট্টর অহিংসবাদীরা এক সময় প্রশ্ন তোলেন: সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি আস্থাবান কোন নেতার একটি জেলার কংগ্রেস সভাপতি পদে থাকা সমীচীন কিনা। এখানে উল্লেখ্য, শরৎচন্দ্র স্বয়ং তখন হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি।

শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন, একশ্রেণীর কর্মীর মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক আচার-আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি তাতে কিন্তু কোন ক্ষোভ বা অভিমান প্রকাশ করলেন না। বরং অনুগামীদের খোলা মনেই বললেন: আমরা নন-ভায়োলেন্স বা অহিংসাব্রত গ্রহণ করেছি। কিন্তু যাঁরা তা' গ্রহণ করেননি, তার জন্য তাঁরা ভ্রান্ত এ কথা কি করে বলা যায়? ভারত উদ্ধার আমাদের পথেই হবে, অন্য কোনও পথে হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? হাসতে হাসতে যাঁরা ফাঁসিতে ঝুলছে, তাঁরা দেশের স্বাধীনতাকে পেছিয়ে দিচ্ছে, এ কথার মধ্যে গোঁড়ামি ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

সাধারণ কর্মীদের বক্তব্য শরৎচন্দ্র শুনতেন। কিন্তু তা তাঁর বক্তব্যের বিরোধী হলে তিনি ঐসব কর্মীদের উপর ক্ষুব্ধ হতেন না। বরং আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যেমে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজে মনে করতেন: গান্ধীজীর কাছে দেশের স্বাধীনতার চেয়েও অনেক বেশি বড় ছিলো তাঁর অহিংসা-ধর্ম। প্রসঙ্গতঃ তিনি সহকর্মীদের বলেন: তাঁর (মহাত্মাজী) কথা আলাদা। অহিংসা হচ্ছে তাঁর অন্তরের জ্বলন্ত বিশ্বাস—এ তাঁর আদর্শ। এর চেয়ে ধ্রুব কোনও নীতি তাঁর জীবনে আর নেই। দেশের স্বাধীনতার চেয়েও অহিংসাই তাঁর কাছে বড়। তাঁকে শ্রদ্ধা করি তাঁর সততা ও আন্তরিকতার জন্য। তেমনি যাঁদের ধ্রুব সত্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা; সমান আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে যাঁরা হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়ে যাঁরা স্বাধীনতার পথ তৈরি করছেন, তাঁদেরও সমান শ্রদ্ধা করি। তাঁরাও আমার নমস্য।

হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তখনকার দিনে সন্ত্রাসবাদীদের একাধিক গোপন ঘাঁটি ছিল। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়েই বিপ্লবীরা ঐসব গোপন ঘাঁটি পরিচালনা করতেন। জেলার এবং বাইরের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা গোপনে ঐসব কর্মকেন্দ্রে যাতায়াত করতেন। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী একসময় হাওড়া জেলার ঐসব গোপন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তা পরিচালনার মূল দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন। বিপিনবিহারী ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা ছিলেন। বয়সেও তিনি কিছুটা ছোট ছিলেন। তা হলেও শরৎচন্দ্র নিষ্ঠাবান ও বিপ্লবী স্বদেশকর্মী বিপিন-বিহারীকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন সামতাবেড়ের লাগোয়া এক গ্রামের দরিদ্র এক কৃষক পরিবারে বিপিনবিহারী সুদীর্ঘকাল আত্মগোপন করেছিলেন। সে খবরও শরৎচন্দ্র জানতেন।

জেলার বিপ্লবীদের গোপন কর্মকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো। শরৎচন্দ্র প্রায় নিয়মিতভাবেই সেই

কর্মকেন্দ্র পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য করতেন। একদিনের ঘটনার কথা শরৎচন্দ্র তাঁর এক বন্ধুকে বলেছেন : ...ওঁদের কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হঠাৎ একদিন রাত্রে এক মহিলা তাঁর কাছে গিয়ে হাজির। শরৎচন্দ্র প্রথমে একটু অপ্রস্তুত। তারপর বুঝতে পারলেন, মহিলাবেশী ঐ আগন্তুক বিপ্লবী বিপিনবিহারী। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হলো। তারপর তিনি তাঁর হাতে প্রয়োজনীয় কিছু টাকা দিলেন। বিপিনবিহারী মহিলার বেশেই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

শরৎচন্দ্র বলেছেন : বিপিনবিহারী কতবার তাঁর বাড়িতে এসেছেন, রাজনৈতিক আলোচনা করেছেন, নানা পরামর্শ নিয়েছেন এবং দিয়েছেন। কখনও মহিলার বেশে, কখনও দরিদ্র কৃষকের বেশে, আবার কখনও বা ফেরিওয়ালা সেজে আলু ফেরি করতে করতে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের গোপন সম্পর্ক যত গভীর হতে থাকল অহিংসায় বিশ্বাসী কংগ্রেস কর্মীদের মনে নীতি ও আদর্শের প্রশ্ন ততই মাথা চাড়া দিতে লাগল। একসময় তাঁদের একদল অভিযোগ তুললেন : হাই কম্যাণ্ডের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন কেন ? ঐ নীতির প্রশ্নে যখন গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সৃষ্টি হলো, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্র ধীর কণ্ঠে তার স্পষ্ট জবাব দিলেন : সন্ত্রাসমূলক কাজে আমি বিশ্বাস করি না সত্য, কিন্তু তবুও কি জানি ঐ বিপ্লবীদের প্রতি আমার দুর্বলতা ও সহানুভূতি আছে। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য যে যেপথেই কাজ করুক না কেন, আমি সকলকেই শ্রদ্ধা করি। সেই জন্য তাঁদের খোঁজখবরও রাখি। এবং নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্যও করে থাকি।

১৯২৬ সালের আগস্ট মাস। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' প্রকাশিত হলো। সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল।

'পথের দাবীর' নায়কের বিপ্লবী-চরিত্র বাংলাদেশের বিপ্লবী-আত্মাকে নতুন করে নাড়া দিল। আর বিদেশী সরকারকে ঐ উপন্যাসের বিপ্লবী-চরিত্র বিচলিত করল। সঙ্গে সঙ্গে তারা 'পথের দাবী' উপন্যাস বে-আইনী বলে ঘোষণা করে বাজার থেকে সমস্ত বই তুলে নিল। রাজনৈতিক ঐ উপন্যাস যাতে দেশের মানুষ পড়তে না পারে তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হলো।

বিপ্লবীরা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পেয়ে আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁরা সেই উপন্যাসকে 'স্বাধীনতার বেদ'রূপে গ্রহণ করলেন। 'পথের দাবী'র গোপন চাহিদা বেড়ে গেল। বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটিতে 'পথের দাবী' নিয়ে নানা আলোচনা বিশ্লেষণ চলল। উপন্যাসের নায়ক সব্যসাচীর বলিষ্ঠ ও জ্বালাময়ী সংলাপ—'আমি চাই না দেশের সমৃদ্ধি, চাই না দেশের কল্যাণ। আমি চাই দেশের স্বাধীনতা'।...বিপ্লবীদের অন্তরে যেন নতুন করে বিপ্লবের আগুন জ্বালাল। বিপ্লবীরা শরৎচন্দ্রকে মনে মনে তাঁদের আদর্শের নেতা বলে গ্রহণ করলেন। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই গোপনে শরৎচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন।

শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন ছিল হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে গ্রামে। আর সেই গ্রামের লাগোয়া ছিল বিস্তীর্ণ রূপনারায়ণ নদ। বিপ্লবীরা এরপর থেকে রূপনারায়ণের বুকে ডিঙি ভাসিয়ে গভীর রাত্রে শরৎচন্দ্রের বাড়ি যেতেন। সেখানে তাঁদের থাকা খাওয়া এবং বিশ্রামের জন্য গোপন ব্যবস্থাও ছিল। তাঁরা তাঁদের কাজ সেরে আলো ফোটার আগেই আবার ডিঙি ভাসিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্রের একটি রিভলভার ছিল। সব সময় তিনি তা সঙ্গে রাখতেন। রিভলভারের লাইসেন্স নবীকরণের জন্য বছরে একবার তাঁকে পুলিশের কাছে যেতে হতো। একদিন ঐ রিভলভারের

লাইসেন্স নবীকরণের জন্য শরৎচন্দ্রকে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হয়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি 'পথের দাবী' প্রসঙ্গ তোলেন। এবং বলেন: যিনি 'পথের দাবীর' বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন, সন্ত্রাসবাদীদের নাড়ির খবর রাখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক!

শরৎচন্দ্র টেগার্ট সাহেবের ঐ সন্দিগ্ধ প্রশ্নের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন টেগার্ট সাহেব তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকেন, শরৎচন্দ্র তখন পাল্টা প্রশ্ন করেন: আপনার যদি তাই বিশ্বাস, তবে আমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না?

শরৎচন্দ্রের স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ উক্তিতে টেগার্ট সাহেব স্তম্ভিত হন। তিনি আর ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন না।

পুলিশ কি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের গোপন যোগাযোগের কোন খবর জানত? সম্ভবতঃ তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর তারা জানতে পারত না। কেননা, খুব সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের গোপন যোগসূত্র ছিল। ঐপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন: তাঁর পল্লীভবনে খুব সঙ্গোপনে বিপ্লবীরা নানাজনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। পুলিশের চেয়েও তাঁরা অত্যন্ত সচেতন এবং সতর্ক ছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি একদিন একটি কাহিনী তাঁর বন্ধুদের শোনান। তিনি বলেন: একবার বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলির শ' সাতেক টাকার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গভীর রাত্রে তিনি মহিলার বেশে তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। তারপর প্রয়োজনীয় টাকা নিয়ে মহিলাবেশী বিপিন সেই রাত্রেই তাঁর গোপন আস্তানায় চলে যান। তাঁর পেছনে সব সময়ই পুলিশ থাকত। কিন্তু সেই রাত্রে আচমকা তিনি এমনভাবে উপস্থিত হন যে, পুলিশ তাঁর গতিবিধি ধরতে পারেনি। বিপিনবাবুর সেই বিস্ময়কর অভিযানের কথা তিনি বহুবার বহুজনের কাছে সগর্বে প্রকাশ করেছেন। এবং বলেছেন: বেতনভুক পুলিশের চেয়ে বিপ্লবীদের

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা আর সতর্কতা ছিলো ঢের বেশী।

জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর সেবার ইংরেজ সেনারা বেপরোয়াভাবে গুলি ছুঁড়লো। তাদের উন্মত্ত ও পাশবিক আক্রমণে শত শত ভারতবাসীর মৃত্যু হল। সেই হত্যা আর অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা দেশে ক্রোধের ঝড় উঠল। অহিংসাপরায়ণ মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ শুরু করলেন।

বাংলার বিপ্লবীরা কিন্তু ঐ হিংস্রতার প্রতিবাদে অহিংসা আর সত্যাগ্রহে অবিচল থাকতে পারলেন না। রক্তের বদলে তাঁরা রক্তের জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন। বাংলার বিপ্লবী আত্মা নতুন রূপে জেগে উঠল।

এদিকে বিদেশী সরকার তার নির্মম ও হিংস্র নীতির ব্যাপক প্রয়োগে আরও হিংস্র, আরও নগ্ন হয়ে উঠল। শহরে-গ্রামে হাজার হাজার প্রতিবাদমুখর মানুষকে পাইকারি হারে গ্রেপ্তার করতে শুরু করল, মুখের ভাষা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলল। সাংবাদিকদের লেখনি কেড়ে নেওয়া হলো। দেশময় জরুরী আইন ঘোষণা করা হলো।

সেই সময় লাহোরের একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীনাথ রায়। হিংস্র আক্রমণের প্রতিবাদ করায় তিনি গ্রেপ্তার হলেন। ঐ পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিক অমল হোমও যুক্ত ছিলেন। তিনি ইংরেজ সেনার মারমূর্তির হাত থেকে অল্পের জন্য রেহাই পান। সে খবর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্র শুনলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও ঐ বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছেন। আনন্দে আত্মহারা শরৎচন্দ্র অমল হোমকে লিখলেন: তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে। ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এটা একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিলো। দরকার মনে করলে ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিলো এতদিন। এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো।...

আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলুম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন

…সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশসাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশহাত কিনা, বলুন!…

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে শরৎচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি আদর্শ ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রায় সর্ব সময় দেশবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে তিনি চরকা কেটেছেন, খদ্দর পরেছেন। এবং তার ব্যাপক প্রচারের জন্যও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। একসময় শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানে চরকার প্রচলন ও খদ্দর ব্যবহারের জন্য শরৎচন্দ্র কবিকে অনুরোধও করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ঐ অনুরোধ শুনে কবিগুরু তাঁব সঙ্গে এক-মত হতে পারেননি। ফলে শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ এবং বেদনাহত হন। এবং হতাশা নিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন। চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ঐ ধরনের উদ্যোগ ও উৎসাহ সেদিন সাধারণ মানুষকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালের বাস্তব অভিজ্ঞতা বোধ হয় শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। তিনি নিজে চরকা কাটা এবং খদ্দর ব্যবহার ছেড়ে দেন। তাঁর অন্তরের বিশ্বাস তিনি কখনও লুকোননি। স্পষ্টভাবে প্রয়োজনে প্রকাশ করেছেন।

গান্ধীজী একবার কলকাতা এসে 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার কার্যালয় পরিদর্শনে যান। তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তিনি বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসেরও সভাপতি ছিলেন। গান্ধীজী দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পত্রিকার কার্যালয়ে গেলেন। তারপর সব দেখাশুনা ও আলোচনার পর গান্ধীজীর নির্দেশমত সবাই চরকা কাটতে বসলেন।

গান্ধীজীর পাশেই বসেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর চরকা কাটায় মুগ্ধ হয়ে গান্ধীজী শরৎচন্দ্রের প্রশংসা করলেন। শরৎচন্দ্র আনন্দের হাসি হাসলেন, কিন্তু তিনি তাঁর অন্তরের বিশ্বাসকে গোপন করলেন না। সবিনয়ে গান্ধীজীকে বললেন: I think, attainment of Swaraj can only be helped by soldiers, and not by splinders.

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি।

আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে সারা দেশে বিপুল সাড়া জেগেছে। চারদিকে অহিংস-অসহযোগ। হঠাৎ উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় এক অঘটন ঘটল। চৌরিচৌরা গ্রামের পুলিশের ফাঁড়ি থেকে একদল পুলিশ অহিংস্ আন্দোলনকারীদের শোভাযাত্রার ওপর গুলি ছুঁড়ল। গুলি ফুরিয়ে গেলে উত্তেজিত ও আক্রান্ত আন্দোলকারীদের মধ্য থেকে একদল লোক থানা আক্রমণ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ফলে কয়েকজন পুলিশ আগুনে পুড়ে মারা গেল।

সেই দুঃসংবাদ মহাত্মা গান্ধীকে অত্যন্ত ব্যথিত করল। তিনি মনে করলেন, অহিংসভাবে আইন অমান্য করার মানসিকতা দেশবাসীর তখনও তৈরি হয়নি। তাই ঐ ঘটনায় তিনি শোক প্রকাশ করে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পাঁচদিন ধরে প্রায়োপবেশন করলেন। তারপর বারদোলীতে কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের ডেকে এক সভায় আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবং ঐ সিদ্ধান্তের কথা সারা দেশের কংগ্রেস নেতাদের জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

শরৎচন্দ্র তখন বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনকারীদের একজন অন্যতম নেতা। ঐ নির্দেশে তিনি বিস্মিত ও হতবাক। মহাত্মার ঐ আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশে তাঁর মন ভেঙে গেল। সখেদে তিনি তাঁর সহকর্মীদের বললেন: গোটা কয়েক কনেস্টবল infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে, তাতে কি হয়েছে? এতেই

গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো। রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারদিকে; সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কীসের, দুঃখ কীসের—কীসের অনুতাপ এতে?

শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী আত্মা যেন কেঁপে উঠল। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থেকে আবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: নন্-ভাওলেন্স খুব noble idea কিন্তু achievement of freedom is nobler—hundred times nobler.

শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট ও সংগঠক

১৯২৭-২৮ সালের কথা। বাংলার যুব ও ছাত্রসমাজের কাছে শরৎচন্দ্র তখন এক আদর্শ পুরুষ। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতায় সারাদেশে এক অভাবনীয় সাড়া জাগল। যুব-ছাত্র ও বিশিষ্ট নেতারা তাঁর কাছে যান। নানা মত ও পথ নিয়ে গোপনে পরামর্শ করেন।

সুভাষচন্দ্র, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, সন্তোষ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দেশের বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী সুদীর্ঘকাল জেলে বন্দী ছিলেন। ঐ সময় তাঁরা সবাই মুক্তি পেলেন। তাঁদের মুক্তির খবরে সারা দেশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও যেন নতুন করে স্বদেশ সেবার কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা পেলেন।

হাওড়ার শিবপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন শরৎচন্দ্র ঘন ঘন কয়েকটি ঘরোয়া সভা ডাকেন। তিনি নিজে তখন হাওড়া জেলার কংগ্রেস সভাপতি। ঐ সভাগুলি খুবই গোপনে ডাকা হতো। কেবলমাত্র তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী ও অনুগামীদের ঐসব সভায় তিনি

ডাকতেন। সভাগুলি সংগঠনের জন্য তিনি শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, অগম দত্ত ও জীবন মাইতি প্রমুখ তরুণ অনুগামীদের ওপর বিশেষ-ভাবে দায়িত্ব দিতেন। সন্তোষ কুমার মিত্র, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ সুবোধ বসু সহ বহু বিশিষ্ট নেতাও ঐ সব ঘরোয়া সভায় নিয়মিত-ভাবে উপস্থিত থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া সভা ডাকার মূল উদ্দেশ্য আগে কেউই জানতে পারেননি। সভাগুলিতে তিনি বিদেশী শাসনের অবসান ও সে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা, জমিদারি প্রথার বিলোপ, দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে বিশদ-ভাবে আলোচনা করতেন। তারপর একদিন সকল প্রবীণ এবং তরুণ কর্মীদের কাছে তিনি এক চাঞ্চল্যকর বক্তব্য ও পরিকল্পনা পেশ করলেন। বললেন: বাংলাদেশে একটি সোশ্যালিষ্ট পার্টি বা সমাজ-বাদী দল গঠন করা প্রয়োজন। তিনি তাঁর কারণ এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও সভায় আলোচনা করলেন। তারপর সেই কাজ যাতে যথা-সত্বর শুরু করা হয় সেজন্য কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন।

শরৎচন্দ্রের নির্দেশে সমাজবাদী নীতিতে বিশ্বাসী কর্মীরা কিছু-দিনের মধ্যে তার একটি কর্মকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করলেন। মধ্য কলকাতার অক্রুর দত্ত লেনের ঐ কর্মকেন্দ্রের দায়িত্ব নিলেন পান্নালাল মিত্র এবং নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সর্বসময়ের জন্য তাঁরা ঐ কেন্দ্রের দেখাশুনা করতে লাগলেন। সমাজবাদী উপদলের কাজকর্ম অবিলম্বেই শুরু হলো। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কালীকুমার সেন, শচী বাগচি, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী, নীরোদ খাঁ, আশু দাস, আবদুল মোমিন, অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন জেলার রাজনৈতিক নেতারা ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন। শরৎচন্দ্র নতুনভাবে সমাজের বঞ্চিত লাঞ্ছিত শ্রমিকশ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন।

সমাজবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ শরৎচন্দ্র কর্মীদের বললেন: ...আজ

আমাদের দেশের শ্রমিকরা জাগ্রত নয়, সংঘবদ্ধ নয়। পীড়ন এবং শোষণও তাদের উপরে অকথ্য বর্বরভাবে চলছে। আজ তোমাদের দরকার রয়েছে তাদের জাগাবার কাজে, সংঘবদ্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে। কিন্তু জেনো, যেদিন এদের ঘুম ভাঙবে, এদের ভিতরে সংঘবদ্ধতা আসবে, সেদিন ওদের নিজেদের ভিতর থেকেই ওদের নেতা তৈরী হবে, তোমরা হবে অনাবশ্যক। সেদিন ওদের পরিচালনার ভার ওদের নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে খুশি মনে যেন চলে আসতে পারো।...কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন চিরকাল ওদের নেতৃত্ব করবার মোহ মনের মধ্যে না জন্মায়।...

শ্রমিকেরা নিজেদের আন্দোলন নিজেরাই পরিচালনা করার যোগ্য হয়ে যাতে ওঠে সেটুকু service যদি তাদের দিতে পারো, সেইটেই হবে তোমাদের best service।...নিজেদের কিছুদিনের জন্য তাদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তার দরকার আছে। কিন্তু হারিয়ে ফেলো না।

কথাশিল্পীর কথায় তাঁর অনুগামীরা যেন নতুন পথের ইঙ্গিত পেলেন। শ্রমিকশ্রেণীর জন্য তাদের নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হলো। তারা কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। ঠিক সেই সময় হঠাৎ হাওড়ার একটি কারখানার একদল শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করলেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের অভিযোগ, এ. জে. মেইন কোম্পানির বিদেশী কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর নানারকম অত্যাচার এবং অবিচার চালায়। দিন দিন তাদের বঞ্চনা বেড়েই চলেছে। প্রতিবাদ করতে গেলে ছাঁটাইয়ের হুমকি দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও। সুতরাং জেলার শ্রমিকদের অধিকার ও দাবি সম্বন্ধে তিনিও কম উৎসাহী নন। তিনি তাঁর তিন অনুগামী শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, জীবন মাইতি ও অগম দত্তকে নির্দেশ দিলেন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করতে, তাদের পাশে দাঁড়াতে। তাঁরাও বোধ হয় ঐ নির্দেশের আশাতেই ছিলেন। শ্রমিকের স্বার্থে শরৎচন্দ্রের

চিন্তাধারার কথা তাঁরা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই অনুগামীরা মহা উৎসাহ নিয়ে গিয়ে সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। নেতার নির্দেশ মতো তাঁরা শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনা ও তাদের সংঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সেই সুযোগে তাঁরা এ. জে. মেইন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে একটি ইউনিয়নও গড়ে ফেললেন। তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন ডাঃ সুবোধ বসু, কিশোরী ঘোষ, কানাইলাল গাঙ্গুলি প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক ইউনিয়ন দেখতে দেখতে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্রের নির্দেশে জেলা কংগ্রেসের নানা সাহায্য ও নৈতিক সমর্থনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল বাড়াল। অনেকদিন পর্যন্ত সেই ধর্মঘট চলল। এবং বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের কাছে বিদেশী মালিকরা নতি স্বীকার করে তাদের নায্য দাবি মানতে বাধ্য হলো। শ্রমিকদের বিজয় সংবাদ শরৎচন্দ্রকে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে আরও উৎসাহ জোগাল।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন বিখ্যাত আইনজীবী বরদা পাইন। সহ-সভাপতি ও কমিশনার পদে আর যাঁরা ছিলেন সকলেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং শরৎচন্দ্র। এমনি সময়কার কথা। প্রকারান্তে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনার দায়দায়িত্ব প্রায় কংগ্রেসের হাতেই ছিল।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার ও মেথরদের নিয়ে সেই সময় একটি ইউনিয়ন গড়া হলো। তার সম্পাদক হলেন শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। আর সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা। দিন কয়েক আগের শ্রমিক ধর্মঘটে বিজয়লাভের পর উদ্যোক্তারা ঐ ইউনিয়ন গঠনে বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা পেলেন। মেথর ও ঝাড়ুদারদের অভিযোগ ছিল, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ

তাদের ওপর নানারূপ উৎপীড়ন ও অবিচার করেন। ন্যায্য দাবি থেকে তারা বঞ্চিত। অবজ্ঞা আর অবহেলা করে কেউ তাদের বক্তব্য শোনেন না, ইত্যাদি। অথচ মিউনিসিপ্যালিটি তখন কংগ্রেসের পরিচালনাধীন বলা চলে।

নব গঠিত শ্রমিক ইউনিয়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো: দাবি আদায়ের জন্য ঝাড়ুদার ও মেথররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করবে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ইউনিয়নের পরিচালকরা সবার আগে জেলা সভাপতি শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করলেন।

শরৎচন্দ্র সব শুনে অবাক। উদ্যোক্তাদের হাসতে হাসতে বললেন: তোমরা তা হলে গুরু মারা বিদ্যা আরম্ভ করলে?

: না, ঠিক তা নয়। মিউনিসিপ্যালিটি কংগ্রেসের পরিচালনাধীন হলেও, সেখানে যে অন্যায়-অবিচার চলছে, তা দূর করা দরকার। তা ছাড়া ঝাড়ুদার-মেথররা মনে করছে, কংগ্রেসই বোধহয় অব্যবস্থার জন্য দায়ি। তাই ইউনিয়ন গড়ে তুলে অন্যায়-অবিচার দূর করার আমরা উদ্যোগী হয়েছি।···

সব শুনে শরৎচন্দ্র বললেন: না, তোমাদের বাজিয়ে দেখলুম। পেছিয়ে এলে চলবে না। কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। দেখতে হবে সংঘর্ষটা কীসের জন্য হচ্ছে, কার সঙ্গে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। সমাজে মুচি-মেথরদের মত বঞ্চিত-লাঞ্ছিত আর কেউ নয়। তোমরা যখন ঐসব লাঞ্ছিত-বঞ্চিতদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে নেমেছো, তাতে কোন দ্বিধা-সংকোচের কিছু নেই। এগিয়ে যাও।···

ধর্মঘট শুরু হলো। হাওড়া শহরের সে কী অবস্থা। মল-ময়লা পরিষ্কার হয় না। সারা শহরের অবস্থা দুর্বিসহ হলো। ধর্ম-ঘটীরা বুঝলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই তাদের বিজয় অবধার্য। ঝাড়ুদার-মেথরদের জোট আরও শক্তিশালী হতে লাগল।

এমন সময় কোন কোন কংগ্রেস নেতা এবং মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার জেলার কংগ্রেস সভাপতি শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন।

যেসব কংগ্রেস কর্মী ইউনিয়ন গড়ে ঐ আন্দোলন শুরু করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

শরৎচন্দ্র তাঁদের অনুরোধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। ধমকের সুরে বললেন: No, by no means. ধর্মঘট যারা করেছে তাদের দাবি যদি সত্য হয়, তা হলে আগে সে সম্বন্ধে সঙ্গত ব্যবস্থা করো।

ধর্মঘট আরও ব্যাপক হলো। ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ এবং একদল কংগ্রেস কর্মী মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে সব ব্যবস্থা তদারক শুরু করলেন। এমন সময় একদিন ইউনিয়নের সম্পাদক শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের ওপর একদল লোক অতর্কিতে হামলা করল। শরৎচন্দ্রের কাছে মুহূর্তেই ঐ খবর পৌঁছুল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: This is sheer cowardice. একটা ছোট ছেলেকে এমনি বর্বরের মত ঠেঙিয়ে এরা ধর্মঘট ভাঙতে চায়?

শরৎচন্দ্রের তখন এক অন্যরূপ। তিনি উত্তেজনায় লজ্জায় ঘৃণায় কাঁপতে লাগলেন। কংগ্রেসের পরিচালনায় মিউনিসিপ্যালিটি চলছে। আর তার কর্তৃপক্ষ এমনিভাবে ধর্মঘট ভাঙবার চক্রান্ত করবে?

ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র হুমকি দিলেন: I can see the unseen hands in this game. Tell everybody that I want immediate settlement of the strike, otherwise I will issue a statement and taboo the municipality.

শরৎচন্দ্রের ঐ ক্ষুব্ধ নির্দেশে মিউনিসিপ্যালিটির কংগ্রেসী সদস্যরা বিব্রত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মিউনিসি-প্যালিটির সদস্যরা বসে ধর্মঘটীদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। এইভাবে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মেথর-ঝাড়ু-দাররা তাদের আন্দোলনে বিজয়ী হলো।

ইউনিয়নের কর্মকর্তারা বিজয় সংবাদ নিয়ে ছুটে গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁরা বললেন: আপনার জন্যই মেথর-ঝাড়ুদারদের আন্দোলনে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে। আপনি

কংগ্রেস সভাপতিরূপে যদি ঐ কঠোর হুমকি না দিতেন, তা হলে হয় তো এতটা তাড়াতাড়ি ধর্মঘটের অবসান সম্ভব হতো না।

শরৎচন্দ্র স্মিতহাসি হেসে বললেন: না, নিজেদের শক্তিতে তোমরা জিতেছো। নিজেদের চেষ্টা না থাকলে কেউ বিজয়ী হতে পারে না। ধর্ম ও ন্যায় যেখানে পীড়িত হয়, প্রতিকার সেখানে আপনিই নেমে আসে। সুতরাং অন্যায়-অবিচার এবং অবজ্ঞার প্রতিবাদে ধর্মঘটীদের এ জয় ছিলো অবধার্য, অবশ্যম্ভাবী।

একটু থেমে শরৎচন্দ্র কী যেন ভাবলেন। তারপর আবার বলে চললেন: সত্যের সাধনা করবে, শিবের সাধনা করবে। কিন্তু পরিশেষে সুন্দরের সাধনাতেই নিজেকে চরিতার্থ করতে হবে। এটা কখনও ভুলে যেও না।...মনে রেখো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও ওদের (শ্রমিকদের) ওপরে মোড়লী করবার যেন মোহ না জন্মায়। সাবালক হলেই ওদের দায়িত্ব ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবার মতন করে মনকে তৈরী রেখো।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে অনুগামীদের সেদিন তিনি শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায়, শ্রমিকদের প্রতি তাঁর দরদ ও মমত্ববোধ কতটা গভীর ছিল। রাজনৈতিক কর্মীদের তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করতে বলেছেন। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে নেতৃত্ববোধ এলে তাদের হাতেই আন্দোলন পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব তুলে দিতে বলেছেন।

হাওড়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বর্ধনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে হঠাৎ এক শূন্যতার সৃষ্টি হলো। স্তম্ভিত ভারতবাসী থমকে

দাঁড়াল। স্বদেশী কর্মীদের চোখে মুখে বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা: এর পর কে, এবং কি? মহাত্মা গান্ধী লিখলেন: The giant amongst men has fallen, Bengal is widowed. ওদিকে সুভাষচন্দ্র তখন কারান্তরালে। ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কারাগারে তিনি বন্দী। শত-সহস্র মুক্তি সংগ্রামী কারারুদ্ধ। শরৎচন্দ্রের মতো দূরদ্রষ্টা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাও তখন দ্বিধাগ্রস্ত। যে উদ্দাম আর উদ্দীপনা নিয়ে তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন, হঠাৎ তাতেও ভাঁটা পড়ল। সামতাবেড়ের পল্লীবাসে গিয়ে পুনরায় তিনি সাহিত্যসেবায় আত্ম-নিয়োগ করলেন।

দেখতে দেখতে প্রায় একটা বছর কাটল। সেটা ১৯২৭ সাল। মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন কারামুক্ত হলেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতারাও। প্রায় দুশো রাজনৈতিক কর্মী ঐ সময় বন্দীদশা শেষ করে ঘরে ফিরে এলেন।

বিদেশী শাসনের প্রতিবাদ করতে যাঁরা কারাগারে সুদীর্ঘদিন বন্দীদশা কাটিয়ে এলেন, বাইরে এসে তাঁরা যেন আরও অসহায় বোধ করতে লাগলেন। যেহেতু ওঁরা বিপ্লবী এবং বিদেশী সরকার ওঁদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছিল, সাধারণ মানুষ তাঁদের আশ্রয় দিতে এবং কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই প্রায় তাঁদের এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

ওদিকে যাঁরা গান্ধীবাদী দেশকর্মী ছিলেন, তাঁরাও বিপ্লবীদের সুনজরে দেখতেন না। জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে জেলে গেলেও, তাঁরা যেহেতু বিদেশী শাসকের চোখে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী, সেইজন্য দেশবাসীর কাছেও তাঁরা উপযুক্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলেন।

ক্ষোভে-দুঃখে আর অনুতাপে শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত। সহকর্মীদের ডেকে বললেন: দেশের জন্য যাঁরা নিজেদের রিক্ত করেছেন, নিঃস্ব করেছেন, আজকে তাঁরাই হবেন দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া যাঁদের আর কিছুই নেই, দেশ হবে তাঁদের প্রতি বিমুখ?

কেন?...আই, বি, আর স্পেশাল ব্রাঞ্চ এখনও দেশের লোকের মনকে শাসন করবে? কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যাঁরা ধরা পড়লেন, রাজবন্দী হলেন, আজ কংগ্রেস তাঁদের বরণ করবে না কেন? সম্বর্দ্ধনা জানাবে না কেন? গভর্ণমেণ্ট তাঁদের রেভলিউশনারি বলেছে বলে? তাঁরা হিংসাশ্রয়ী এই কথা গভর্ণমেণ্ট রটিয়েছে বলে? গভর্ণমেণ্ট কি হবে আমাদের conscience-keeper? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা identify করবো গভর্ণমেণ্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means. We must receive them and congratulate them openly and whole-heartedly.

কখনও উত্তেজিত, কখনও শান্তভাবে শরৎচন্দ্র কথাগুলো বলে চললেন কর্মীদের কাছে। আর সহকর্মীরাও অধীর আগ্রহে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে চললেন তাঁর বক্তব্য। তাদের চোখেমুখেও ঐ একই প্রশ্ন।

শরৎচন্দ্র সহকর্মী আর অনুগামীদের চোখের ভাষা মুহূর্তেই বুঝে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ ঘোষণা করলেন: ...কলকাতাতেই এটা প্রথমে হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তা যখন হলো না তখন আমরাই প্রথম করবো। তোমরা এর ব্যবস্থা করো ... হাওড়াতে সমস্ত মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরিক সম্বর্দ্ধনা দেবো। জাঁকাল সভা করতে হবে। এমন জমকালো করে এঁদের অভ্যর্থনা করতে হবে, যাতে দেশের মধ্যে একটা moral impression হয়।

শরৎচন্দ্রের নির্দেশের জন্যই বোধহয় তাঁর অনুগামী দল অপেক্ষা করছিলো। এবার তাঁদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা দেখা দিল। হাওড়ায় রাজনৈতিক বন্দী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হলো। শরৎচন্দ্র হলেন সেই সমিতির সভাপতি।

নির্দিষ্ট দিনে হাওড়া টাউন হলে রাজবন্দীদের সম্বর্দ্ধনা সভা শুরু হলো। কাতারে কাতারে মানুষ এল সেই সভায়। ফুল মালা আর চন্দন দিয়ে সাধারণ মানুষ উপস্থিত রাজবন্দীদের বরণ করতে লাগলেন। অভূতপূর্ব দৃশ্য শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করল। রাজ-বন্দীরা পেলেন বীরের সম্মান। আবেগকম্পিত কণ্ঠে শরৎচন্দ্র

বললেন : দেশের জন্য এঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। এঁরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্ণমেণ্ট এঁদের ভয় করে। কারণ জানে, এঁদের তপস্যার মধ্যেই তৈরি হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্ণমেণ্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলো না ধ্বংস করতে এঁদের মনের অপরাজেয় বল ; আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চিরচঞ্চল, চিরজীবী, চির তরুণ এঁরা। দেশের তরুণদের আমি বলি, তোমাদের এতবড় আপনজন, এতবড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।...

হাওড়ার রাজনৈতিক বন্দী সম্বর্ধনার খবর সারা দেশের বন্দী আত্মাকে মুহূর্তেই যেন জাগিয়ে তুলল। দেশব্যাপী তার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বর্ধনা জানাতে শহরে-গ্রামে সম্বর্ধনা সমিতি গড়ে উঠল। তার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও যুব সম্মেলনেরও আয়োজন চলল। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলি, পূর্ণ দাস, অমর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সমেত অন্যান্য রাজবন্দীদের সভাপতি করে দেশের সর্বত্র সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। ঐসব অনুষ্ঠান-মঞ্চ থেকে নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। এতদিন বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের ভয়ে যে দেশবাসী ভীতসন্ত্রস্ত ও রুদ্ধকণ্ঠ ছিল, এবার তারাও নতুন প্রেরণায় নিঃশঙ্ক-চিত্তে এগিয়ে এল। সারা দেশ দেশমাতৃকার মুক্তি পূজায় মেতে উঠল।

শরৎচন্দ্র সেদিন হাওড়ায় মুক্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করে যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের তা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর স্বদেশচিন্তার ঐ সার্থক প্রকাশ সেদিন বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন পথের সূচনা করেছিল।

তরুণ-যুব-ছাত্র সমাজের কাছে শরৎচন্দ্র তখন এক আদর্শ নেতা। তাঁর দেশাত্মবোধক রচনা, জ্বালাময়ী ভাষণ এবং নিত্যনতুন পরিকল্পনা

মুক্তিকামী যুবশক্তির মধ্যে নতুন চেতনাবোধ সৃষ্টি করল। রাজনৈতিক বন্দী সম্বর্ধনার পর নিতানতুন ঘটনা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে একের পর এক ঘটনা সেদিন বিপ্লবী বাংলার মানুষকে সচকিত করে তুলতে লাগল। প্রায় প্রতিটি ঘটনার নায়ক যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী।

অনুজা সেন কর্তৃক তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব লালবাজারে তাঁর সুরক্ষিত কক্ষে আক্রান্ত, সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যুবশক্তির উত্থান এবং ইংরেজ সেনাদের অস্ত্রাগার দখল, সাহেবদের ক্লাবে আচমকা আক্রমণ চালাতে গিয়ে চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মহুতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত লাটসাহেবের উদ্দেশে বীণা দাসের গুলিবর্ষণ, খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে ঢুকে বিনয়-বাদল-দীনেশের ঐতিহাসিক 'অলিন্দ যুদ্ধ'—ঘটনার পর ঘটনা। ভারতের কোটি কোটি মানুষ সেদিন আশ্চর্য জিজ্ঞাসা আর বিস্ময় নিয়ে বিপ্লবী বাংলার দিকে তাকিয়ে। বাংলার বিপ্লবী আত্মা সেই যুগসন্ধিক্ষণে নিত্যনতুন পৌরুষদীপ্ত ইতিহাস রচনায় মগ্ন, আর সারা ভারতে মুক্তিকামী মানুষ সেই প্রাণ আর প্রেরণার জোয়ারে প্লাবিত।

রবীন্দ্রনাথ : রাজনীতি এবং মতবিরোধ

১৯৩৬ সালের ১৫ জুলাই।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে বিরাট সমাবেশ। দেশের গুণীজ্ঞানী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমাগম। সভাপতি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। উদ্বোধক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

ভারত শাসনের জন্য সেদিন বিলাতে বসে ব্রিটিশ সরকার যে আইন পাস করে, তা ছিল অভিসন্ধিমূলক। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সেদিন বিদেশী সরকারের ঐ আইনকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা বুঝেছিলেন, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর দোহাই তুলে বিদেশী শাসক দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও অবিশ্বাসের বীজ রোপণ করতে সচেষ্ট। তাতে প্রথমেই বাংলার হিন্দুদের স্বার্থ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন হতে বাধ্য। তাই সেদিন সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র বিদেশী শাসকের কুটিল চক্রান্তের প্রতিবাদ জানাতে দেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানান। সভার উদ্বোধন করতে উঠে শরৎচন্দ্র খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করেন: বাংলার হিন্দুজনগণের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদেরই একজন।

হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সেদিন একই মঞ্চ থেকে অপ্রিয় সত্য যে বলিষ্ঠ বক্তব্য ঘোষণা করেছিলেন, তা অনেককে বিস্মিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে কুখ্যাত ভারত শাসন আইন পাস করেন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল থেকে ঐ আইন চালু করার সিদ্ধান্তও হয়। ঐ আইনের খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখে দেশের চিন্তাশীল সমাজ বেশ বুঝতে পারলেন, আইনের নামে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলাই শাসক শক্তির মূল উদ্দেশ্য। বাংলার হিন্দুরা সংখ্যালঘু এই যুক্তিতে তখন বাংলা ভাষায় আনুপাতিক হারে উর্দু-আরবী ভাষা ব্যবহারেরও প্রশ্ন ওঠে। সব বিচার-বিবেচনার পর সারাদেশে ক্ষোভের ঝড় ওঠে। ১৯৩৬ সালের গোড়ায় ব্রিটিশ রাজের গোপন চক্রান্তের প্রতিবাদ জানাতে একটি দাবিপত্র তৈরী হয়। উদ্দেশ্য, ভারত-সচিবকে বাংলার জনগণের প্রতিবাদ জানিয়ে দাবিপত্র পেশ করা। ঐতিহাসিক সেই রাজনৈতিক দলিল, দাবিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই স্বাক্ষর করেন। তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত ঐ দাবিপত্র অবশেষে বিলাতেও পাঠানো হয়

দাবিপত্রের বয়ান ছিল:

(ক) বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অন্যান্য প্রদেশে

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, বাংলার হিন্দুদের জন্যও সেই সকল ব্যবস্থা করা হোক।

(খ) হিন্দুরা যৌথ বা সম্মিলিত নির্বাচনে বিশ্বাসী। পৃথক নির্বাচন প্রথা আত্মকর্তৃত্বশীল শাসনতন্ত্রের বিরোধী। গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে পৃথক পৃথক নির্বাচন প্রথার নজির নাই।

(গ) যাঁরা আসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্যই তার সমর্থন করেন। যদি আসন সংরক্ষণ করিতেই হয়, তবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্যই করা উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য নয়।

(ঘ) হিন্দুদের দাবি সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন যেন বর্তমান ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার হিন্দুদের সদস্য-সংখ্যার অনুপাতেই ভবিষ্যতে তাদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, তদানীন্তন ব্রিটিশরাজ সেই দাবিপত্র গ্রাহ্য করলেন না। ভারত-সচিব বিলাত থেকে ভারতের বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন : ১৯৩৫ সালে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে যে আইন গৃহীত হয়েছে, তার কোনো পরিবর্তন করা হবে না। হুবহু তা-ই চালু করতে হবে।

ভারত-সচিবের সেই স্পর্ধিত নির্দেশ সারা দেশে, বিশেষ করে বাংলায়, তীব্র ক্ষোভের ঝড় তুললো। টাউন হলের অধিবেশনের মাত্র ক'দিন পরে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে আবার বিরাট এক জনসভার আয়োজন করা হলো। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভার সভাপতি। তিনি বললেন : নতুন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এতবড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না।···নিজের শক্তিমত আমি আজন্মকাল সাহিত্যসেবা করে এসেছি। যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায়, এবং এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছি।···আমার ভয় হয়, হয়তো দশ বৎসরের

মধ্যে সাহিত্যের আর একটা যুগ এসে পড়বে।...তাই এখন হতে সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ছি।

...বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত করার একটা হীন প্রচেষ্টা চলছে, কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর, কেউ বলছেন, এতগুলি ফারসী কথা ব্যবহার কর, আবার কেউ বা বলছেন এতগুলি উর্দু কথা ব্যবহার কর।...

শরৎচন্দ্রের স্বদেশ চিন্তায় কোনরকম ফাঁকি ছিল না। তিনি যা যুক্তিগ্রাহ্য মনে করতেন, শত অপ্রিয় মনে হলেও অকপটে তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতেন। বাংলার সেই যুগসন্ধিক্ষণে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে সেদিন অনেকেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তা প্রকাশ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন। বাঙালী বা হিন্দুর প্রতি অবিচার বা অন্যায়ের প্রতিবাদকে কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী সেদিন 'সংকীর্ণতা' বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আর বেদনা সেদিন যাঁদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সেদিন একই মঞ্চ থেকে ব্রিটিশ রাজের কুটিল চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বলা বাহুল্য, সেদিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে উভয়ের রাজনৈতিক চিন্তা এবং বক্তব্য ছিল এক এবং অভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। কিন্তু রাজনৈতিক নানা বিষয়ে অনেক সময় কথা-শিল্পীর সঙ্গে কবিগুরুর মতপার্থক্যও প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মতান্তর বা ভিন্ন চিন্তা দেখা দিলেও তা কখনও তাঁদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বহুবার রাজনৈতিক মতভেদ ঘটে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাত্রছাত্রীদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে আহ্বান জানান, শরৎচন্দ্র ছিলেন তার পূর্ণ সমর্থক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই সময় কোনও একটি দৈনিক

পত্রিকায় পর পর তিনখানি পত্র প্রকাশ করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বর্জন করানোর নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রবীন্দ্রনাথের ঐ মতামত প্রকাশ পেলে গান্ধীজীও তা দেখেন। এবং বিদেশী সরকার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি ১৯২১ সালের জুন সংখ্যার Young India-তে লেখেন :

The poet's concern is largely about the students. He is of opinion that they should not have been called upon to give up Government Schools before they had other schools to go to. Here I must differ from him.···I am firmly of opinion that the Government Schools have un-manned us, rendered us helpless and Godless···

শরৎচন্দ্রও সেদিন কবির বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। শিক্ষা বর্জন প্রসঙ্গে কবির সঙ্গে শরৎচন্দ্রেরও মতান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : অসহযোগের দ্বারা ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চীনের প্রাচীরের মত ব্যবধান রচনা করা হচ্ছে।···

কবির সেই বক্তব্যের প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো শরৎচন্দ্রের এক লিখিত অভিভাষণে। 'ফরবেস ম্যানসনে' আয়োজিত এক বিরাট রাজনৈতিক সমাবেশে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ' নামে যে বক্তব্য রাখলেন তা মূলতঃ কবির বক্তব্যেরই প্রতিবাদস্বরূপ।

তিনি লিখলেন :

···পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের প্রতি যদি সে শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে তো লুব্ধ চিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভালো। ···যে শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তা' তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না, এবং আমার বিশ্বাস, দিতেও পারে না। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।···

…কোনো বড়ো জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না। সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না,—এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস—আত্মনির্ভরতা। এই সত্যটা আজ আমাদের বোঝবার দিন এসেছে। ঠকিয়ে-মজিয়ে… বা কেড়ে-ঠিকড়ে…নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে।…আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত, আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল। আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি তো সে পরম দুর্ভাগ্য।

…বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়। শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়।…

শরৎচন্দ্রের ঐ রাজনৈতিক অভিভাষণ সেদিন সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এবং গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রসারে দারুণভাবে সহায়তা করেছিল।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকবার মন কষাকষি হয় অসহযোগ আন্দোলনের মুখে। জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে সারা দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। তারই সঙ্গে শুরু হলো চরকা ও খদ্দরের ব্যাপক প্রচলন। শরৎচন্দ্র নিজেও তখন চরকা এবং খদ্দরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছুটলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি আবেদন রাখলেন : শান্তিনিকেতনে চরকা-খদ্দর প্রচারের ব্যবস্থা করা হোক।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন ঐ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেননি। শরৎচন্দ্র তাই ব্যর্থ হয়ে কলকাতা ফেরেন। চরকা-খদ্দর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সেদিন যে মতপার্থক্য দেখা দেয়, রাজনৈতিক ইতিহাসে তাও একটি স্মরণীয় ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাস 'পথের দাবী' ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করলেন। রাজদ্রোহের রসদ খুঁজে পেলেন তারা ঐ উপন্যাসের পাতায় পাতায়। তাই যেখানে যত কপি বই পাওয়া গেল, তা তুলে নেওয়া হলো। 'পথের দাবীর' প্রচার-প্রকাশ বন্ধ। যার কাছে ঐ বই পাওয়া যাবে, তাকেও গ্রেপ্তার করার হুকুম জারী হলো। বিদেশী সরকারের স্পর্ধিত ঘোষণায় শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেন। সাহিত্যের ওপর ঐ আক্রমণের প্রতিবাদ জানাতে মানসিক দিক থেকে তিনি তৈরি হতে লাগলেন। এবং ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলেন। তিনি চাইলেন, সরকারের ঐ কার্যকলাপ এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কবিগুরু প্রতিবাদ করুন। সারা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং তার ফলে বিদেশী শাসকের নগ্নরূপ তাদের কাছে আরও ভালোভাবে ফুটে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' পড়লেন। কিন্তু সরকারের বাজেয়াপ্ত ঘোষণার প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন না।

এমনকি ঐ প্রসঙ্গে কবি সেদিন ব্রিটিশ কার্যকলাপের সমালোচনা করে কোনো বক্তব্যও তিনি প্রকাশ করলেন না। কবি বরং 'পথের দাবী' পড়ে শরৎচন্দ্রকে এক চিঠি লিখে মতামত জানালেন। কবি লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তা হলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করা চাই। ইংরেজরাও ক্ষমা করবেন, সেই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব, সেটাতে পৌরুষ

নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে এই দেখলেম, একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়। পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র। তাতে ইংরেজরাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়. নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তা হলে অপর পক্ষের থাকা উচিত চারিত্রিক জোর। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছে দাবি করি, নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে-কোন দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে। রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না। এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তা হলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই। অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে

আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে, সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।...

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হন। তিনি আশা করেছিলেন, 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে ইংরেজরাজ যে অন্যায় করেছে, তার সেই স্পর্ধিত অন্যায়ের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ কিছু লিখবেন অথবা তার প্রতিবাদের কোনো পথনির্দেশ দেবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তিনি তার কোনো উল্লেখ না দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন। ঐ প্রসঙ্গে 'পথের দাবীর' প্রকাশক এবং স্নেহাস্পদ বন্ধু উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র সখেদে লেখেন :

...শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেয়েছি। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, স্বদেশ-বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমতাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুক বোঝা গেল, এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।...

'পথের দাবী' উপন্যাস বাজেয়াপ্ত ঘোষণার খবর শরৎচন্দ্রের কাছে পুত্রশোকের মতোই বেদনাদায়ক হয়েছিল। অনেক কিছু আশা ছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তা না পেয়ে মর্মাহত শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির একটি উত্তর লিখলেন। এবং তাতে তীব্র ক্ষোভ এবং অভিমানের সুর ফুটে উঠল। সেই কড়া চিঠি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হবে, কি হবে না, তাই নিয়ে উমাপ্রসাদ

বাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র আলোচনা করলেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরাসরি কোনো বাদ-প্রতিবাদে যেতে তাঁরা আর আগ্রহী হলেন না। তাই চিঠিখানা শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ বাবুর কাছেই রেখে দিলেন। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৩৬০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধে সেই চিঠিটি প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা শরৎচন্দ্রের ঐ চিঠি, যা কবির কাছে আর পাঠানো হয়নি, তা হুবহু এখানে তুলে দেওয়া হলো।

'শ্রীচরণেষু, আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক্। বই-খানা আমার নিজের বলে একটু দুঃখ হবারই কথা। কিন্তু সে কিছু নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে, সে সম্বন্ধে আমার দু'একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম, লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ আমি তা' করিনি। করলে পলেটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাংলাভাষায় এধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমি যে অব্যহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন, এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দু'দিন আগে-পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু

এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি আর অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্মই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে, এ সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয়, তার জন্মে হাইকোর্টে আপিল করা চলে; কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয় তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজ-বন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ, ছানা, মাখন পায় না বলে কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গাপূজার পয়সা পাই না কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়তো তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমতাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরনের। যা উচিত মনে করেছি, তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ শক্তির এ বই

বাজেয়াপ্ত করার জাস্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে 'প্রোটেষ্ট' করার 'জাস্টিফিকেশন'ও তেমনি আছে

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি, এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈচৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতা আপনার অত্যন্ত বেশী। আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হ'ত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি। যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যিকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই সমস্ত ছেড়েছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে, সামর্থ্যে, সময়ে কত যে গেছে, সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এল। এখন সত্যিকার কিছু একটা করার ভারী ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথায় রূঢ় হয়ে থাকে, আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন। সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশ-মাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।'

রবীন্দ্রনাথ 'পথের দাবী' পড়ার পর শরৎচন্দ্রকে চিঠি লেখেন ১৩৩৩ সালের ২৭শে মাঘ তারিখে। আর শরৎচন্দ্র সেই চিঠির জবাব লেখেন তার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে, ২রা ফাল্গুন। শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠির ভাষায় তাঁর মনের যে উত্তাপ প্রকাশ পেয়েছে, খুব সহজেই তা ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্র তাঁর মনের ব্যথা, তাঁর দারুণ হতাশার কথা চেপে

রাখতে পারেননি বা চাননি। ঐ ব্যথা ও বেদনার কথা বহুদিন শরৎচন্দ্রের মনে দাগ কেটে ছিল। বলা বাহুল্য ঐ ঘটনার পর শরৎচন্দ্র সুদীর্ঘকাল কবির কাছে যাননি এবং তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগও রাখেননি। 'পথের দাবী' ছিল রাজনৈতিক উপন্যাস। রাজনৈতিক বিচারেই বিদেশী সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এবং তা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, শরৎচন্দ্রের ঐ উপন্যাস বিদেশী সরকারকেও শঙ্কিত করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা তখনকার দিনের রাজনীতিকদের মনে নানা প্রশ্ন তুলেছিল। 'পথের দাবী' নিয়ে কবিগুরু এবং কথাশিল্পীর মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, তার কারণ ছিল উভয়ের ভিন্নমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী।

মহাত্মাজীর সান্নিধ্য : বিশ্বাস-অবিশ্বাস

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। সেই থেকেই তিনি সুদীর্ঘকাল জাতীয় কংগ্রেসের একজন নেতা। ঐ সূত্রে তিনি গান্ধীজী, বিঠলভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপাল আচারী প্রমুখ সর্বভারতীয় জাতীয় নেতাদের নিবিড় সান্নিধ্য পান।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু। সারা দেশব্যাপী যখন অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবন, গান্ধীজীর দূত হিসাবে বাংলাদেশে দেশবন্ধু তখন ঐ আন্দোলনের অগ্রনায়ক। দেশবন্ধুর অসীম প্রভাব, ব্যক্তিত্ব আর সর্বস্ব ত্যাগের কাহিনী তখন দেশবাসীর বিস্ময়। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর নিবিড় সান্নিধ্যে যান।

মহাত্মা গান্ধী একবার দেশবন্ধুর বাড়িতে বসে। অসহযোগ

আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে গান্ধীজী একান্তে আলোচনারত। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হলো। শরৎচন্দ্র ঐ কর্মসূচীর সমর্থনে মহাত্মা গান্ধীকে বলেন: Mahatmaji, you have discovered the most dreadful and invincible weapon—Non-cooperation. If our people withdraw their cooperation, the Government will collapse in a day. We can then get Swaraj not in a year, but in twentyfour hours.

সেবার মহাত্মাজী কলকাতায় দেশবন্ধুর বাড়িতে বাংলাদেশের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে নানা সলাপরামর্শে ব্যস্ত। তারই এক ফাঁকে কে একজন প্রশ্ন তুললেন: কোন্ বাঙালীর সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়?

সেই প্রশ্ন শুনে কিরণশঙ্কর রায় বলে উঠলেন: সে গৌরবের অধিকারী আমি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বুয়র যুদ্ধের অ্যাম্বুলেন্স কোরের কিছু প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে তখন গান্ধীজী বিলাতে ছিলেন। আমিও ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তখন বিলাতে। গান্ধীজীর তখন বাংলা ভাষা শেখার সখ হয়। এবং আমাকে তিনি বাংলা শেখানোর জন্য তাঁর গৃহশিক্ষক রাখেন।

দেশবন্ধু সব শুনে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন: তাই নাকি? ছাত্রটিকে কতখানি বাংলা শিখিয়েছিলে, কিরণ?

কিরণশঙ্করও সহাস্যে উত্তর দেন: ছাত্রটি তেমন ধারালো ছিলেন না। তাই বাংলা শিক্ষা ততটা এগোয়নি।...

শরৎচন্দ্র এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলেন। এবার গান্ধীজীকে প্রশ্ন করলেন: Mahatmaji, Kiron was your Guru in England?

মহাত্মাজী একটু হেসে বললেন: Yes, he taught me Bengali.

শরৎচন্দ্র রসিকতা করে উত্তর দেন: That is why you could not learn it.

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে গান্ধীজীসহ সকলেই হেসে উঠলেন।

আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন। দেশবন্ধু সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু অধিবেশনের আগেই দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর অবর্তমানে হাকিম আজমল খাঁ আমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেন। ঐ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করে মহাত্মা গান্ধীকে সেই আন্দোলনের সর্বময় ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো।

অধিবেশনের পর মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের বারদৌলী তালুকে গেলেন। স্থির করলেন, সর্বপ্রথম তিনি সেখানে সরকারি খাজনা বন্ধ করার ডাক দেবেন। তারপর ক্রমে সারা দেশে তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

সারা দেশে তখন চরম উত্তেজনা। অহিংস অসহযোগের জোয়ার দেশময় এক নতুন চেতনাবোধ জাগিয়েছে। সাধারণ মানুষ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। এমন এক সময় উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামের একদল অহিংস অসহযোগকারীর ওপর পুলিশ গুলি চালাল। অসহযোগ-কারীরা তাতে ক্ষুব্ধ হলেন। গুলি ফুরিয়ে গেলে পুলিশ গিয়ে থানায় আশ্রয় নিল। অহিংস অসহযোগীদের মধ্য থেকে একদল উত্তেজিত হয়ে গিয়ে থানায় আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে কয়েকজন পুলিশ সেখানে মারা গেল। ঘটনাকাল ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস।

ঐ দুঃসংবাদ পেয়ে মহাত্মাজী মর্মাহত হলেন। তিনি মত প্রকাশ করলেন—অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন করার মতো মানসিকতা তখনও দেশবাসীর তৈরি হয়নি। সেই ঘটনার প্রতিবাদে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি পাঁচদিনের প্রায়োপবেশন করলেন। তারপর ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বারদৌলীতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা ডেকে প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন প্রত্যাহার বিখ্যাত বারদৌলী হল্ট (Bardouli halt) নামেই সবিশেষ খ্যাত।

মহাত্মা গান্ধীর সেই আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনায় সারা দেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখ দিল। জাগ্রত ভারত-আত্মার সকল উৎসাহ উদ্দীপনা যেন মুহূর্তেই নিভে গেল। বলা বাহুল্য, তার ফলে দেশবাসীর উপর মহাত্মাজীর প্রভাবও দারুণভাবে কমে গেল।

বিদেশী সরকার বোধহয় সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। ১০ই মার্চ তারিখে তারা গান্ধীজীকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করল এবং ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের খবরে শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেন। বিদেশী শাসকের কঠোর সমালোচনায় তিনি যখন মুখর সেই সময় দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র 'মহাত্মাজী' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা এক মূল্যবান দলিল হিসাবে গণ্য। তিনি লিখলেন : ···দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠ চিত্তে বলি দিতেই এই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিলো তাঁহার (মহাত্মার) তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবী-ব্যাপী এই যে উদ্ধত জাঁতাকলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা, বন্দুক-বারুদ-কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে।···

মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন।···রাজ-শক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে, কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি (মহাত্মা) প্রাণ পণ করিয়াছিলেন।···

শরৎচন্দ্রের ঐতিহাসিক ঐ রচনায় সেদিন মহাত্মাজীর প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, তেমনি হৃদয়হীন বিদেশী রাজশক্তির প্রতিও ঘৃণা অবজ্ঞা আর অনাস্থাও প্রকাশ পায়। প্রকাশ্যে শরৎচন্দ্র

মহাত্মাজীর উদ্দেশে সেদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও, ঐ বারদোলী হল্‌ট বা অসহযোগ প্রত্যাহারের ঘটনায় তিনি সবিশেষ মর্মাহত হন। ভাঙা মনে তিনি একাধিক রাজনৈতিক সহকর্মীর কাছে বলেন : মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানো। Mass revolution একেবারেই নষ্ট হয়ে গেলো। এ আন্দোলন আর রিভাইভ করবে না।...ভেবেছিলুম এই আন্দোলনে স্বরাজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু মহাত্মাজী আন্দোলন আরম্ভই করলেন না।

অসহযোগের শুরুতে চৌরিচৌরায় অসহযোগকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ এবং তার পরিণতিতে সমগ্র দেশের মুক্তি আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় শরৎচন্দ্র যে কতটা হতাশ এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন এবং কী দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন তা তাঁর নানা বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক সহকর্মী এবং বিশেষ স্নেহাস্পদ বন্ধু শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ঐ আন্দোলন প্রত্যাহারের কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। শরৎচন্দ্র সেই প্রসঙ্গ তুলে তাঁদের বলেন : গোটা কয়েক কনেষ্টবল infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এতবড় বিরাট দেশের মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারদিকে। সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল! এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ?...নন-ভায়ওলেন্স খুব noble idea, কিন্তু achievement of freedom is nobler—hundred times nobler.

কংগ্রেসে যোগদানের পর থেকেই শরৎচন্দ্র খদ্দর ব্যবহার শুরু করেন। তিনি চরকাও কাটতেন। চরকার প্রবর্তন এবং খদ্দর ব্যবহারের জন্য তিনি একসময় শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা করেন। তিনি কবিগুরুর কাছে শান্তিনিকেতনে চরকা

এবং খদ্দর চালু করার জন্য আবেদন জানান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধ না রাখায় শরৎচন্দ্র হতাশা এবং ক্ষোভ নিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন। গান্ধীজীর প্রবর্তিত চরকা ও খদ্দর প্রচারের জন্য শরৎচন্দ্রের জীবনে ঐ ধরনের আরও বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে।

পরবর্তীকালে অবশ্য শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি এক সময় চরকা ও খদ্দর প্রচারের চেষ্টা ছেড়ে দেন। তিনি বলতেন: দেশে কাপড়ের কল তৈরি করা হোক। এদেশী সুতায় যদি সারা ভারতের কাপড়ের চাহিদা মেটানো সম্ভব না হয়, তবে ব্রিটিশের দেশ ছাড়া জাপান অথবা অন্যদেশ থেকে সুতা কিনে এনে এদেশে তাঁতের কাপড় তৈরির ব্যবস্থা করা হোক। খদ্দর এবং চরকা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন: ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশী ক্রোর টাকার অভাব পূরণ করা যায় না। কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।...

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খদ্দর আর চরকা যুক্ত করার প্রশ্নেও শরৎচন্দ্রকে এক সময় মহাত্মাজীর সমালোচনা করতে দেখা যায়। তিনি একসময় সখেদে তাই লিখেছিলেন: মহাত্মাজী তাঁর আন্দোলনের (অসহযোগ) টিকি বেঁধে দিলেন চরকার সঙ্গে।

গান্ধীজীর মত ও পথ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র স্পষ্টভাবে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাও প্রকাশ করেছেন। প্রয়োজনে শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর সমালোচনা করেছেন সত্য, কিন্তু কখনও তিনি গান্ধীজীকে 'মহাত্মাজী' ছাড়া সম্বোধন করেননি। জাতীয় নেতা এবং মুক্তিকামী জনতার অবিসম্বাদী নেতা হিসাবেই তিনি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন।

চরকা এবং খদ্দরের প্রতি পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ ও বিশ্বাস না থাকলেও, একজন কংগ্রেস কর্মী হিসাবে তিনি চরকা কাটার অভ্যাস করতেন এবং খদ্দর ব্যবহারও করতেন। খদ্দর এবং চরকার প্রতি তাঁর অনীহার খবরটা শেষ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীও

একদিন জানতে পারেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বিশ্বাসকে নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই মহাত্মাজীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

বৌবাজারের হুজুরীমল লেনে তখন 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার কার্যালয়। 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা তদানীন্তন মুক্তি আন্দোলনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সেই পত্রিকার সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও। মহাত্মাজী দেশবন্ধুর বাড়ি থেকে রওনা হলেন ঐ পত্রিকা অফিসে। সঙ্গে দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্রসহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক। পত্রিকা কার্যালয়ে গিয়ে মহাত্মাজী সকলকে সঙ্গে নিয়ে চরকা কাটতে বসলেন। মহাত্মাজী লক্ষ্য করলেন, শরৎচন্দ্রের কাটা সুতা খুব মিহি। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি শ্যামসুন্দরবাবুর কাটা সুতা আনুপাতিক হারে অনেক মোটা হচ্ছিল।

মহাত্মাজী তাই দেখে হাসতে হাসতে বললেন: Look, look, the President of the B. P. C. C is spinning ropes.

তাঁর রসিকতায় সকলে হেসে উঠলেন। খানিকক্ষণ বাদে চরকা চালাতে চালাতে শরৎচন্দ্র বললেন: Nearer the Church, remoter from God.

মহাত্মা গান্ধী এবার সুযোগ পেয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন: Sarat Badu, you have no faith in charka ?

শরৎচন্দ্রের সবিনয় উত্তর: No Mahatmaji, not a jot.

মহাত্মা: But you spin better than many lovers of charka।

শরৎচন্দ্র: I have learnt spinning because I have love for you though not for the charka.

মৃদু হেসে মহাত্মাজী আবার প্রশ্ন করলেন: But why don't you believe that attainment of Swaraj will be helped by spinning ?

শরৎচন্দ্র বললেন: No, I don't believe, Mahatmaji. I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers, and not by spiders.

শরৎচন্দ্র মহাত্মাজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু প্রশ্নে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক মহাত্মাজীর সমালোচনা করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের মুক্তিকামী মানুষ যখন মাতৃভূমির স্বরাজ লাভের জন্য জীবন পণ করেছেন, ঠিক সেই সময় এদেশের মুসলমানরা সারা ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করলেন। তাদের সে আন্দোলনও ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু অসহযোগ আর খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের

অসহযোগ আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন। আর খিলাফৎ আন্দোলন মূলতঃ একটা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। তুরস্কের সুলতান মুসলমান জগতের ধর্মগুরু বা খলিফারূপে গণ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন তুরস্কের সুলতান জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা যুদ্ধজয়ী হয়। শান্তি রক্ষার নামে তুরস্কে তারা ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন করে এবং সুলতানকে নজরবন্দী করে রাখে। ফলে খলিফার অবমাননা হয়েছে এই অভিযোগে এদেশের মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেন।

সারা দেশে পাশাপাশি দুটি চরিত্রের দুটি আন্দোলন চলল। কংগ্রেসের একদল নেতা মনে করলেন, মুসলমানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে খিলাফৎ আন্দোলন করছেন। অসহযোগও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। সুতরাং ঐ দুই আন্দোলনের মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করতে পারলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। এবং তার ফলে অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমান সমাজের কাছ থেকেও প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাবে। খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্যোক্তারাও অবশ্য ঐ সময় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সমর্থন পাওয়ার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ

সম্মেলনের জন্য যে আমন্ত্রণপত্র প্রচার করা হয় তাতেও উল্লেখ করা হয়—হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করলে মুসলমান সমাজ এদেশে গো-বধ পর্যন্ত বন্ধ করতে রাজী। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করার জন্য উভয় পক্ষই অবশ্য নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগসূত্র বার করে একটা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র সে-সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুব সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থনের প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সংযুক্তির প্রতিবাদ করেন আর ঐ সংযুক্তির চুক্তিকে মহাত্মাজীর এক 'মারাত্মক ভুল' বলেও সেদিন শরৎচন্দ্র মত প্রকাশ করেন। নির্ভীক শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যে সেদিন যৌথ আন্দোলনের উদ্যোগকে একটা ঘুষ বা গোঁজামিল বলে অভিহিত করেন। ঐ প্রসঙ্গে তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' নামক প্রবন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন, তা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলা চলে। তিনি লেখেন : ···খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য।··· যে দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে দেশের মানুষ কি খায়, কি পরে, কি রকম চেহারা—কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল। এখন যদিচ তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে,—এ কোন সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এসো, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি. এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় সুরু কর।

…এমন ঘুষ দিয়া প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে লোক ভর্ত্তি করা যায়? না করিলেই বিজয়-লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

…জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি হয় কি গোঁজামিলে? মুক্তি-অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কিনা!…

সহকর্মী ও সহমর্মী সুভাষচন্দ্র

খবরের কাগজ পড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু অবিনাশ ঘোষালকে বলেন : না, তোমাদের মত খবরের কাগজ পড়ার আমার বাতিক নেই। তবে খবরের কাগজের মন্তব্য পড়তে আমার খুব মজা লাগে। এক কলমব্যাপী সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইংরেজ সরকারের কত রকমারি অন্যায়ের বর্ণনা শেষে মন্তব্য কিনা—এটা কি সরকারের উচিত হয়েছে?…ভাগ্যিস দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশে জন্মেছিল, নইলে দেশের কি অবস্থা হতো, বলতো? এঁরা না থাকলে বাংলাদেশের রাজনীতি ঐ স্বদেশী যুগেই থেমে যেত।

শরৎচন্দ্রের এই সাদাসিধে বক্তব্যে পরাধীন ভারতের এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সম্পর্কে যেমন হতাশা প্রকাশ পেয়েছে, আবার দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও তেমনি প্রকাশ পেয়েছে গভীর আস্থা আর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

শরৎচন্দ্র ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। সারা ভারতে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। তার ঢেউ এসে বাংলাদেশকেও প্লাবিত করল। সেই প্লাবনের

সামনের সারিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় দেশবন্ধু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন—তাঁকে অভিনন্দনও জানালেন। কিন্তু সাহিত্যিক ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঐ ব্যাপারে তিনি নানাভাবে বাধা পেলেন। তাঁরা সমালোচনা করে বললেন: সাহিত্যিকের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত হবে না।…

শরৎচন্দ্র কিন্তু বন্ধুদের কথা মানতে পারলেন না। তাঁদের সমালোচনার উত্তরে তিনি বললেন: …এটা তোমাদের ভুল। রাজনীতির আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীরই অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি। বিশেষত আমাদের দেশ হল পরাধীন দেশ। এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানত স্বাধীনতার আন্দোলন—মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাহিত্যিকদেরই তো সর্বাগ্রে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ, জাতি গঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই। তোমাদের নির্দেশমত সাহিত্যিকরা যদি বলেন—আমি সাহিত্যিক, সাহিত্য নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেবো না, তা হলে উকিল ব্যারিস্টাররাও বলতে পারেন—আমরা আইন ব্যবসায়ী, মামলা-মোকর্দমা নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেবো না। ছেলেরা বলবে, আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাবো না। তা হলে রাজনীতিটা করবে কে শুনি?

শরৎচন্দ্রের এই স্পষ্ট উক্তি সেদিন যাঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল, যুব নেতা সুভাষচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সুভাষচন্দ্র তখন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যুব নেতা তখন ব্রিটিশ শক্তির কাছে এক বিভীষিকা। বলা চলে প্রায় সেই সূত্র ধরেই সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

অসহযোগ আন্দোলনের নানা পর্যায়ে দেশবন্ধুর দু'পাশের দুই

সৈনিক সুভাষ-শরৎ সেদিন অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। কখনও দেশবন্ধুর নির্দেশে, কখনও নিজেদের উদ্যোগে সুভাষ-শরৎ একসঙ্গে রাজনীতির নানা কাজে ব্যস্ত থেকেছেন।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত মানুষ গড়ে উঠবে না। জাতীয় শিক্ষা এবং ভাবধারায় ছাত্রদের গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অসহযোগের সময় দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন নামে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলো। একই সঙ্গে ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের 'ফরবেস ম্যানসনে' কলিকাতা বিদ্যালয় নামে একটি কলেজও স্থাপন করা হয়। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র বসু। আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত হন বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সংগঠক-শিক্ষাব্রতী রূপে সুভাষ-শরৎ একই সঙ্গে কাজ করেন।

সুভাষচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে মাঝেমধ্যেই আলোচনা-বৈঠক হতো। যতদূর জানা যায়, সুভাষচন্দ্র নানা ব্যাপারে পরামর্শের জন্য শরৎচন্দ্রের বাড়িতেও যাওয়া-আসা করেছেন। তাঁদের বৈঠকে রাজনীতি ছাড়াও নানা প্রসঙ্গে আলোচনা চলত। কখনও কখনও গুরুগম্ভীর আলোচনায় যখন সকলে হাঁপিয়ে উঠতেন, শরৎচন্দ্র তাঁর স্বভাবসুলভ মন্তব্যে সেখানে হালকা হাসির বন্যা নামাতেন।

দিলীপকুমার রায়ের বাড়িতে একবার কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এক আলোচনায় বসেন। সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সেখানে উপস্থিত। নানা কথাবার্তার পর দিলীপবাবু বললেন: সুভাষ, তোমার শরীর তো ভীষণ দুর্বল। ডাক্তারও বলেছেন বিশ্রাম নিতে। এবার কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিলে ভালো হয় না? সুভাষচন্দ্র বললেন: উপায় কি ভাই? কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আর তেমন লোক কোথায়! কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি শরৎ-চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন: তবে শরৎবাবু যদি বাংলার কংগ্রেসের ভার নিতে রাজী হন তো, আমি কিছুদিনের জন্য একটু বিশ্রাম নিতে ভরসা পাই।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন : বুঝলে সুভাষ, আমি ততটা বোকা নই। তুমি ভেবেছ, বি, পি, সি, সির গদীতে আমাকে বসিয়ে তোমার বদলে আমাকে জেলে পাঠাবে? তাতে কি আর আমি রাজী হতে পারি?

হাসতে হাসতে সুভাষচন্দ্র বললেন : জেলে যেতে আপনার এত ভয় কেন? আর আপনাকে কেউ ধরবে না বলে দিচ্ছি। কারণ, আপনি একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক।

শরৎচন্দ্র তাঁর উত্তরে বলেন : তুমি তো বলেই খালাস। হাতকড়া দিয়ে যখন নিয়ে যাবে, তখন দলবল নিয়ে তুমি বরং আমার গলায় একগাছি মালা পরিয়ে দেবে, আর বলবে 'বন্দেমাতরম—শরৎবাবু'। তোমার ঐ সুধা মুখে একবার বন্দেমাতরম শোনার জন্য আর এক-গাছি মালা পরবার জন্য আমি পাঁচ-পাঁচটা বছর জেল খাটতে আদৌ রাজী নই বাপু! শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

অন্য একদিন আরেকটি ঘরোয়া আলোচনায় সুভাষচন্দ্র শরৎ-বাবুকে বল্লেন : অসহযোগ আন্দোলনে সবাই জেলে যাচ্ছে, আপনাকেও তো একবার যেতে হবে শরৎবাবু।

শরৎচন্দ্র খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দেন : আমারও একবার জেলে যাওয়ার ইচ্ছা আছে সুভাষ। কিন্তু মুস্কিল কি জানো? জেলে গেলে নাকি আফিং দেয় না। আফিং ছাড়া যে আমি বাঁচবো না।

সুভাষচন্দ্র : ভাবতে হবে না। আমি আফিং সংগ্রহ করে দেবো।

শরৎচন্দ্র : তুমি আর আমি যে জেলে একসঙ্গে থাকবো—তার কি মানে আছে! আর তুমি যদি আগে জেল থেকে ছাড়া পাও তা হলে? এই আফিং-এর জন্যই তো আমার জেলে যাওয়া হয় না, বুঝলে সুভাষ?

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তখনও একবার জেলে যাওয়া নিয়ে কথা উঠেছিল। হাসতে হাসতে তখন শরৎচন্দ্র

দেশবন্ধুকে বলেছিলেন : শুনেছি জেলে গেলে নাকি আফিং দেয় না। দেখছি, জেলখানাটা আদৌ ভদ্রলোকের জায়গা নয়।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ সঙ্কট দেখা দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে দুটি দল সৃষ্টি হয়। একদিকে থাকেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অপরদিকে সুভাষচন্দ্র বসু। ঐ সময় সুভাষের সমর্থনে যাঁরা সোচ্চার হন, শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। রাজনীতির আসরে, দেশবন্ধুর পরবর্তীকালে, শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রেরই অনুগামী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যৌবনের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা সারা দেশে মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ তুলতে পারবে। তাই তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন—সুভাষের সঙ্গে সভা-সমিতি, যুব সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে বহু ক্ষেত্রে লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়েছে।

১৯৩১ সালের ঘটনা। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে এক যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরাই ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি যুবকদের নানা সমস্যা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র ও যুবকদের কর্তব্য নিয়ে ভাষণ দেন। কিন্তু কুমিল্লা যাওয়ার পথে তিনি কীভাবে সুভাষ-বিরোধী একটি দলের হাতে নিগৃহীত হন—তাঁর চিঠির একটি অংশ উল্লেখ করলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। চিঠিটি লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে। ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ তিনি লেখেন : ···দেশোদ্ধার করার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম শেম বললে, গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে। আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে, কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়—ও মায়া। যাই হোক রূপনারায়ণের

তীরে ফিরে এসেছি। The liberated man has no personal hope —এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকী নেই। জয় হোক কয়লার গুঁড়োর, জয় হোক বারো ঘোড়ার গাড়ির!...

১৯২৮-২৯ সালের কথা। বাংলার রাজনীতিতে একদিকে 'বিগ ফাইভ' অর্থাৎ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং তুলসীচরণ গোস্বামী প্রভাবশালী তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে সামনে রেখে প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের জন্য সক্রিয়। অপরদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে প্রদেশ কংগ্রেসের অগ্রনায়ক করে অন্য একটি দলও ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট। এ নিয়ে সেদিন কংগ্রেসের মধ্যেই দলাদলি দেখা দেয়। ক্ষমতার লড়াই শেষ পর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে যায়, যা রাজনৈতিক পরিবেশকে অত্যন্ত নোংরা ও বিষাক্ত করে তোলে। প্রসঙ্গতঃ, ঐ সময়কার এক রাজনৈতিক নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। শ্লেষের সঙ্গে তিনি সেদিন বলেছিলেন : বাংলাদেশে কারুর পৈতৃক প্রাণটা তার নিজস্ব থাকবার জো নেই। সবাই বেরিয়েছেন সবাইকে ক্যাপচার করতে। দাদারা বেরিয়েছেন ছেলেদের ক্যাপচার করতে, ছেলেরা বেরিয়েছে দাদাদের ক্যাপচার করতে। লীডাররা বেরিয়েছেন চ্যালাদের ক্যাপচার করতে, আর চ্যালারা বেরিয়েছে লীডারদের ক্যাপচার করতে। চারদিকে রব—ক্যাপচার করো, ক্যাপচার করো...।

ঐ ক্যাপচার আর দলাদলির রাজনীতি শরৎচন্দ্র কোনোদিনই পছন্দ করতেন না। তাছাড়া রাজনীতিতে কুৎসা ও নিন্দা প্রচার, অপর পক্ষকে জব্দ করার জন্য অবাঞ্ছিত কৌশল—এসব কোনো কিছুই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু গোষ্ঠীস্বার্থে তখন বাংলার রাজনীতিতে ঐ ধরনের একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেন, দেশসেবার নামে এবং আত্মসেবা অথবা গোষ্ঠীসেবার অছিলায় রাজনীতির মধ্যে নোংরামির নোনা জল ঢুকে পড়ছে। তাই তিনি নিঃশব্দে ঐ ধরনের রাজনীতি থেকে দূরে সরে রইলেন। রাজনীতি

ছাড়তে চাইলেও, তিনি তাঁর রাজনৈতিক বন্ধু সুভাষকে ছাড়তে পারলেন না। তখনও তাঁর সেই এক কথা: সব ছাড়তে পারি, সুভাষকে ছাড়তে পারি না!

রাজনীতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তখন প্রত্যক্ষ কোনো যোগসূত্র নেই। তিনি তখন সাহিত্য সাধনায় মগ্ন। ঠিক সেই সময় হাওড়ায় একটি রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন হলো। উদ্যোক্তারা শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলেন। শরৎচন্দ্র খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন, সেই সম্মেলনে সুভাষকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানাননি। কেননা সুভাষচন্দ্র তাঁদের গোষ্ঠীর সমর্থক নন।

উদ্যোক্তাদের উদ্যম এবং আচরণে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বললেন: সুভাষ যেখানে নিমন্ত্রিত পর্যন্ত হননি, সেখানে আমি যেতে পারি না। শিবহীন যজ্ঞে আমি উপস্থিত থাকতে পারি না।

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র সেই সম্মেলনে আর যোগ দেননি। শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে সুভাষচন্দ্রকে স্বাধীনতা যুদ্ধের 'শিব' বলেই বিশ্বাস করতেন।

রাজনীতির মঞ্চে শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সুদীর্ঘদিন কাজ করেছেন। বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা একসঙ্গে ঘুরেছেন, অজস্র সমস্যার মুখে গোপনে শলাপরামর্শ করেছেন; জটিল সব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। রাজনীতিতে শরৎ-সুভাষের যৌথ অভিযান এককালে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মতো খ্যাতিমান কথাশিল্পীর সঙ্গ পেয়ে যেমন গর্ব বোধ করতেন, শরৎচন্দ্রও যৌবনের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে পেয়ে গৌরব বোধ করতেন। শরৎচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী মনকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। রাজনৈতিক সম্পর্কে তাঁরা যেমন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বা সহযোদ্ধা ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁরা ছিলেন অভিন্নহৃদয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন,

সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতার বাইরে, সুদূর করাচিতে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর খবর পেয়েই তিনি গভীর শোকে ভেঙে পড়েন এবং বলেন: করাচিতে অবতরণ করবামাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাস-সম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সংবাদ পেলাম। একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারিয়েই যে আমরা শোকাভিভূত হয়েছি তা নয়। শোক প্রকাশের অপর কারণ—তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তি-স্তম্ভ!…তাঁর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর। একইভাবে শোকাভিভূত সুভাষচন্দ্র অন্য এক সভায় বলেন: …একাধারে শরৎচন্দ্র ছিলেন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশ-প্রেমিক ও আদর্শ মানব।…

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর গুজরাটের হরিপুরায় যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন বসে সুভাষচন্দ্র সেই অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবনের স্মরণে ঐ সভায় এক শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ দেন, তা থেকেই বোঝা যায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক যোগসূত্র কতটা গভীর ছিল। গুজরাটের হরিপুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন: সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্যগগন থেকে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল। যদিও বহুবর্ষ তাঁর নাম বাংলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্যজগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।…

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন: কংগ্রেসের ব্যাপারে তিনি (শরৎচন্দ্র) অংশগ্রহণ করতেন। এবং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার কংগ্রেস একজন প্রধান সমর্থনকারীকেও হারাল।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর শুধুমাত্র ভাষণ আর মৌখিক সম-বেদনাতেই সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধুকৃত্য শেষ করেননি তদানীন্তন

বাংলার দিকপালদের নিয়ে সংগঠক সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষায়ও উদ্যোগী হন। ১৯৩৮ সালের ২৬শে জানুয়ারি কলকাতায় স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ইন্‌স্টিটিউটে এক নাগরিক শোক-সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন শরৎবন্ধু সুভাষচন্দ্র। এই প্রকাশ্য নাগরিকসভার সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র 'শরৎ স্মৃতিরক্ষা সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীতও হয়।

প্রস্তাবিত স্মৃতিরক্ষা সমিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাসন্তী দেবী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ সুভাষচন্দ্রও যুক্ত ছিলেন। ঐ সমিতির পক্ষ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই টাকা থেকে প্রতি বছর 'শরৎ স্মৃতি বক্তৃতামালা' চালু করতে এবং 'শরৎ স্মৃতি পদক' দেওয়ার ব্যবস্থা করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ সমিতি অনুরোধ জানান। বলা বাহুল্য, পরবর্তী সময়ে 'শরৎ স্মৃতি বক্তৃতামালা' এবং 'শরৎ স্মৃতি পুরস্কারের' নিয়মিত ব্যবস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করেন। সেই ব্যবস্থাপনার পেছনে সমিতির তদানীন্তন সহ-সভাপতি সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং রাজনৈতিক সহমর্মিতা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিশেষ-ভাবে শক্তিশালী করেছিল। শরৎ-সুভাষের গুরুত্বপূর্ণ এবং যৌথ বহু উদ্যোগ স্বাধীন ভারতের এক অমূল্য ইতিহাস, অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

পরিশিষ্ট

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য : তথ্যপঞ্জী

জন্ম : ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর (বাংলা ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩)।

জন্মস্থান : হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম। দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের পিতার মাতুলালয়। মতিলালের পৈত্রিক বাসভূমি কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী মামুদপুর গ্রাম।

পারিবারিক পরিচয় : পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। মতিলালের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। পাঁচ পুত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। শরৎচন্দ্রের পর দুই পুত্র অকালে মারা যায়। চতুর্থ পুত্র প্রভাসচন্দ্র (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী হয়ে স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন), পঞ্চম পুত্র প্রকাশচন্দ্র। কন্যাদ্বয়ের নাম অনিলা ও সুশীলা। অনিলা দেবী শরৎচন্দ্রের দিদি। শোনা যায়, শরৎচন্দ্রের ডাক নাম ছিল 'ন্যাড়া'। শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি বিহারের ভাগলপুর। সেই সূত্রে সেখানে তাঁর ছেলেবেলার অনেকখানি কেটেছে।

বাল্যশিক্ষা : পাঁচ বৎসর বয়সে দেবানন্দপুরে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় শরৎচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। পরে সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাংলা স্কুলে চলে আসেন। প্যারী পণ্ডিতের পুত্র কাশীনাথের সঙ্গে বালক শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ত। একটি বালিকা শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত অনুগত ছিল। সম্ভবতঃ এই বালিকার ছায়া অবলম্বনেই পরবর্তীকালে পার্বতী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি নারীচরিত্রের কল্পনা করা হয়।

ডিহিরিতে বসবাস : শরৎচন্দ্রের বয়স যখন সাত-আট, তাঁর পিতা মতিলাল বিহারের ডিহিরি অঞ্চলে একটি চাকরি নিয়ে সপরিবারে সেখানে চলে যান। বালক শরৎচন্দ্র পিতামাতার সঙ্গে এখানে দুবছর বাস করেছিলেন।

ভাগলপুরে আগমন ও পুনরায় শিক্ষারম্ভ : মতিলাল ডিহিরিতে দুবছর ছিলেন। দুবছর পর তিনি ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে এসে বসবাস করতে

লাগলেন। শরৎচন্দ্রকে স্থানীয় দুর্গাচরণ বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি করে দেওয়া হলো। ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর তিনি টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন; এখান থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর টি. এন. কলেজে এফ. এ পড়তে শুরু করেন। এই সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। শরৎচন্দ্রের পিতা মাতৃহীন ছেলেদের নিয়ে ভাগলপুরেই খঞ্জরপুর নামে একটি অঞ্চলে উঠে গেলেন। পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পারায় শরৎচন্দ্রের আর পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

সাহিত্যচর্চা: শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতির মূল অন্তঃপ্রেরণা ছিলেন তাঁর পিতা। মতিলাল নিজে সাহিত্যরসিক ছিলেন। তাঁর সাহিত্যসৃজন ক্ষমতা বালক শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিল সন্দেহ নেই। দেবানন্দপুর স্কুলে পডবার সময় তিনি 'কাশীনাথ' গল্প রচনা করেন। স্কুলের সহপাঠী কাশীনাথের নামানুযায়ী গল্পের নামকরণ হয়। 'কাকবাসা' নামে একটি গল্পও এই সময় রচিত হয়।

তবে শরৎচন্দ্রের যথার্থ সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল ভাগলপুরে। তাঁর উৎসাহে 'ছায়া' নামে একটি হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এর লেখক তালিকায় ছিলেন শরৎচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি। 'ছায়া' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র রচিত একটি প্রবন্ধের নাম 'ক্ষুদ্রের গৌরব'। এই সময়ে রচিত অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের নাম: (১) অভিমান, (২) বোঝা, (৩) অনুপমার প্রেম, (৪) কোরেলগ্রাম (পরবর্তীকালে এর নাম হয় 'ছবি'), (৫) শিশু (পরবর্তী নাম 'বড়দিদি'), (৬) চন্দ্রনাথ, (৭) হরিচরণ, (৮) দেবদাস, (৯) বাল্যস্মৃতি, (১০) পাষাণ, (১১) শুভদা, (১২) সুকুমারের বাল্যকথা। শরৎচন্দ্র পাণ্ডুলিপির উপর একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন St. C. Lara (St.=শরৎ, C=চট্টোপাধ্যায়, Lara=ল্যাড়া)।

নিরুদ্দেশ: ১৯০০ সালের শেষে কিংবা ১৯০১ সালের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর ছেড়ে নিরুদ্দেশযাত্রা করেন। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। ঘুরতে ঘুরতে মজঃফরপুরে আসেন—এখানে বাঙালী সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

পিতৃবিয়োগ: ১৯০২ সালে শরৎচন্দ্রের বাবা মারা যান। শরৎচন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে ভাগলপুরে এলেন। ছোট ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব পড়ল তাঁর উপর। বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনদের কাছে তাঁদের রাখার ব্যবস্থা করলেন।

প্রথম চাকরি : ভাগলপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলেন চাকরির সন্ধানে। সম্পর্কিত মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তিরিশ টাকা বেতনে একটি চাকরি নিলেন।

রেঙ্গুন গমন : লালমোহনবাবুর ভগ্নিপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুনের এ্যাডভোকেট। একবার তিনি লালমোহনবাবুর বাড়িতে বেড়াতে এলেন। তাঁর মুখে রেঙ্গুনের গল্প শুনে শরৎচন্দ্র সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি রেঙ্গুন রওনা হলেন।

কুন্তলীন পুরস্কার লাভ : কলকাতার এইচ. বোস 'কুন্তলীন' নামে কেশতেল বিক্রী করতেন। প্রতি বৎসর তিনি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের জন্যে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী লেখককে 'কুন্তলীন' পুরস্কার দেওয়া হতো। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাবার আগে 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখে প্রতিযোগিতার জন্যে দিয়ে যান। মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে গল্পটি জমা দেওয়া হয়। এই গল্পটি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করে।

ব্রহ্মদেশ পর্ব : ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র ছিলেন চৌদ্দ বৎসর। প্রথমে তিনি উঠেছিলেন রেঙ্গুনে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে। চাকরি পেয়েছিলেন বর্মা রেলওয়ের অডিট ডিপার্টমেণ্টে। এরপর তিনি কিছুকাল পেগুতে বাস করেন। পেগুতে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অফিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি চাকরি নিলেন। পরে এটি ছেড়ে পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টসে চাকরি করেন। ১৯১২ সালে তিনি একাউনটেণ্ট জেনারেলের অফিসে চাকরি করেন। চাকরির সঙ্গে তিনি ছোট একটা চায়ের দোকানও চালাতেন।

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র সাধারণ লোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাস করতেন। নিজেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এদের মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এই সময় তিনি সংগীতচর্চা ও শিল্পচর্চাও করতেন। এখানেই তিনি কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

কলকাতার ভারতী পত্রিকায় ১৩১৪ সনের আষাঢ় মাসে তাঁর 'বড়দিদি' উপন্যাসটি তিনমাস ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা।

শরৎচন্দ্রের অন্যান্য লেখাও এই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফণীন্দ্র পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকা, সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ও জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা। ব্রহ্মদেশে ও বাংলাদেশে বাসকালে তাঁর যে সকল লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হল:

'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বোঝা' (১৩১৯ কার্তিক-পৌষ), রামের সুমতি (১৩১৯, ফাল্গুন-চৈত্র), পথনির্দেশ (১৩২০, বৈশাখ), বিন্দুর ছেলে (১৩২০, শ্রাবণ), চন্দ্রনাথ (১৩২০, বৈশাখ-আশ্বিন), চরিত্রহীন (১৩২০, শ্রাবণ), নারীর মূল্য (১৩২০, বৈশাখ-আশ্বিন), কানকাটা (১৩২০, আষাঢ়)।

'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বাল্যস্মৃতি (১৩১৯, মাঘ), কাশীনাথ (১৩২০, ফাল্গুন-চৈত্র), অনুপমার প্রেম (১৩২০, চৈত্র), হরিচরণ (১৩২১, আষাঢ়)।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিরাজ বৌ (১৩২০, পৌষ-মাঘ), বৈকুণ্ঠের উইল (১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ), অরক্ষণীয়া (১৩২৩, আশ্বিন), শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী (১৩২৩, বৈশাখ, মাঘ), দেবদাস (১৩২৩, চৈত্র-১৩২৪, আষাঢ়), নিষ্কৃতি (১৩২৩, ভাদ্র-পৌষ), একাদশী বৈরাগী (১৩২৪, কার্তিক), দত্তা (১৩২৪, পৌষ-১৩২৫, ভাদ্র), শ্রীকান্ত (২য়) (১৩২৪, আষাঢ়-১৩২৫, আশ্বিন), গৃহদাহ (১৩২৩, মাঘ-১৩২৬, মাঘ), দেনা-পাওনা (১৩২৭, আষাঢ়-১৩৩০, শ্রাবণ), নববিধান (১৩৩০ মাঘ-১৩৩১, কার্তিক), শ্রীকান্ত (৩য়) (১৩২৭, পৌষ-১৩২৮, পৌষ), অনুরাধা (১৩৪০, চৈত্র), শেষ প্রশ্ন (১৩৩৪, শ্রাবণ-১৩৩৮, বৈশাখ)।

চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'স্বামী' (১৩২৪, শ্রাবণ-ভাদ্র)।

অক্ষয়কুমার সরকার সম্পাদিত 'পল্লীশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মহেশ' (১৩২৯, আশ্বিন)।

রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'পথের দাবী' (১৩২৯, ফাল্গুন-১৩৩২, ফাল্গুন), অভাগীর স্বর্গ (১৩২৯, মাঘ), সতী (১৩৩৪, আষাঢ়)।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'জাগরণ' (১৩৩০, কার্তিক-১৩৩২, বৈশাখ—অসমাপ্ত)।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিলাসী' (১৩২৫, বৈশাখ)।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পূজা বার্ষিকী 'পার্বণী'তে প্রকাশিত হয় 'মামলার ফল' (১৩২৫, আশ্বিন)।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত পূজা বার্ষিকী 'আগমনী'তে প্রকাশিত হয় 'ছবি' (১৩২৬)।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত পূজা বার্ষিকী 'শরতের ফুল'এ প্রকাশিত হয় 'পরেশ' (১৩৩২, ভাদ্র)।

'শারদীয়া বসুমতী'তে প্রকাশিত হয় 'হরিলক্ষ্মী' (১৩৩২)।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাস জ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বাড়ীর কর্তা'। (পরে এটি কাশীর 'উত্তরা' পত্রিকায় ১৩৩৭, অগ্রহায়ণ থেকে 'রসচক্র' নামে বারোয়ারী উপন্যাস হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে।)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ) (১৩৩৮, ফাল্গুন-১৩৩৯, মাঘ), বিপ্রদাস (১৩৩৯, ফাল্গুন-১৩৪০, মাঘ), 'অনাগত'র পরবর্তী নাম 'আগামীকাল' (১৩৪২, শ্রাবণ)। এটি শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যায়।

কলকাতা পর্ব : শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষের' অন্যতম সত্ত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট মাসিক ১০০ টাকা আয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ১৯১৬ সালে কলকাতা চলে আসেন। এখানে তিনি প্রথমদিকে হাওড়ার 'বাজে শিবপুর' নামক স্থানে বাস করেন। পরে হাওড়ার 'পানিত্রাস সামতাবেড়' নামক গ্রামে বাড়ি করে সেখানে বসবাস করেন। জীবনের শেষ দিকে কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি করে সেখানেও কিছুকাল বাস করছিলেন।

বিবাহ : শরৎচন্দ্র দুবার বিবাহ করেছিলেন। দুই বিবাহই রেঙ্গুন বাসকালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম স্ত্রীর নাম শান্তি দেবী। এই পত্নীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র সন্তানও জন্মেছিল। ভয়াবহ প্লেগ শুরু হলে এই পত্নী ও পুত্রের মৃত্যু হয়। এর পর শরৎচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার শ্যামচাঁদপুর গ্রামের অধিবাসী কৃষ্ণদাস অধিকারীর কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদাকে (পরে হিরন্ময়ী দেবী) বিবাহ করেন। হিরন্ময়ী দেবী তখন বাবার সঙ্গে রেঙ্গুনে বাস করতেন। হিরন্ময়ী দেবীর কোন সন্তান হয়নি।

প্রেম : শরৎচন্দ্রের প্রেম সম্পর্কিত নানা কাহিনী শোনা যায়। তিনি নিজে নানা প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রখ্যাত লেখিকা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে

তাঁর প্রেম সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। নিরুপমা দেবীর ডাকনাম 'বুড়ী'। তিনি ভাগলপুরবাসী নফরচন্দ্র ভট্টের কন্যা। শরৎচন্দ্রের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তিনি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত রচনাই যত্ন করে সংশোধন করে দিতেন। এই প্রেমসম্পর্ক বিবাহে পরিণতিলাভ না করার একাধিক কারণ থাকতে পারে। নিরুপমা দেবীর বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের কিছুকাল পরেই তাঁর স্বামী নবগোপাল ভট্ট মারা যান। বালবিধবা নিরুপমা প্রচণ্ড বৈধব্য সংস্কারের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করে রাখেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে বিধবা নিরুপমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব জানিয়ে একটি পত্রও লিখেছিলেন সে প্রস্তাব কিরূপে বা কেন ব্যর্থ হল তা জানা যায় না। শরৎচন্দ্র সারাজীবন ধরেই মনের মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের বেদনা পুষে রেখেছিলেন। নিরুপমা দেবী বৃন্দাবনে লেখিকা রাধারাণী দেবী ও তাঁর স্বামী নরেন্দ্র দেবকে কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'শরৎদার যে বাউণ্ডুলে দশা হয়েছিল, সে শুধু আমারই জন্মে।' শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্মে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর-একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো, এই আমার সান্ত্বনা।' ১৯৫১ সালে নিরুপমা দেবীর মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্র কয়েকটি পত্রে লিখেছিলেন যে ব্রহ্মদেশে থাকার সময় তিনি আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেড় বছর বাস করেন। মেয়েটি রজককন্যা।

ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে এসে শিবপুরে বাস করার সময় তিনি পানিত্রাসে দিদি অনিলা দেবীর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। তখন মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকত একটি সুন্দরী যুবতী। শরৎচন্দ্র তাঁকে নাকি প্রেমিকা হিসাবে পরিচয় দিতেন। এরই ছায়া নিয়ে রচিত হয় 'রাজলক্ষ্মী' চরিত্র।

সামতাবেড় পর্ব : বাজে শিবপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার বাগনান থানার সামতাবেড় গ্রামে রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটি বাড়ি তৈরি করেন। এখানেই তাঁর জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। এখানে বাসকালে তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসগুলি রচিত হয়। সামতাবেড় বাসকালে তিনি গ্রামজীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেন। গ্রামজীবনভিত্তিক তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে সামতাবেড় ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে।

রাজনীতি : শরৎচন্দ্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতে সূর্য সেন, অনন্ত সিং প্রভৃতি বিপ্লবীদের যাতায়াত ছিল। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে বেদনার্ত ও বিরক্ত হয়ে ১৯২২ সালে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

ভ্রমণ : যৌবনে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে ভরতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ব্রহ্মদেশে দীর্ঘকাল বাসকালে সেখানকার অধিকাংশ স্থানেই তিনি ভ্রমণ করেন। রাজনীতি সূত্রে তিনি গয়া, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবন, কাশী, লাহোর (১৩৩৭, আষাঢ়), দেওঘর, শিলচর (১৩৩৩, আষাঢ়), ঢাকা (১৯২৫, এপ্রিল) প্রভৃতি স্থানে তাঁর ভ্রমণের কথা জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে নানা ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। শরৎচন্দ্র যে প্রচণ্ড রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন, তার অনেক পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর গুণগ্রাহী ছিলের তারও অনেক প্রমাণ আছে। ১৯১৬ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'বিচিত্রার' আসরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

সম্বর্ধনা : শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক জীবনের গোড়া থেকেই দেশের অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সম্মান পেয়েছেন। পরবর্তীকালে সেই সম্মান আরও ব্যাপক হয়। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে নানাভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিবসে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভাপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনবাণী পাঠিয়েছিলেন। ১৩৩৯ সালের ২রা আশ্বিন টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে বিরাট সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সভায় সভাপতি হওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু সাংসারিক দুর্বিপাকে রবীন্দ্রনাথ আসতে পারেননি। এ সম্পর্কে তিনি শরৎচন্দ্রকে দুটি পত্র লেখেন এবং 'কালের যাত্রা' নাটিকা তাঁকে উৎসর্গ করেন।

১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান করেন।

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধি দান করেন।

এসব ছাড়াও আরও নানাভাবে নানাস্থানে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধিত করা হয়।

মৃত্যু: শরৎচন্দ্র জীবনের শেষপর্বে নানাভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর ছিল অর্শের পীড়া। সেই সঙ্গে জ্বর, বাত, ফোলা রোগ, উদরাময়, লিভার ও কিডনীর রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতার বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশংকর রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, তাঁর অপারেশন করা হবে। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে ভর্তি করা হলো। প্রখ্যাত সার্জেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পেট অপারেশন করলেন। অপারেশনের পর অবস্থা একটু ভালো হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৬ই জানুয়ারি বেলা দশটায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাস।

॥ গ্রন্থ তালিকা ॥

(প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল অনুযায়ী)

১৯১৩—সেপ্টেম্বর : বড়দিদি (উপন্যাস)

১৯১৪—মে : বিরাজ বৌ („)

জুলাই : বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (গল্পসমষ্টি)

আগস্ট : পরিণীতা (উপন্যাস)

সেপ্টেম্বর : পণ্ডিত মশাই (,,)

১৯১৫—ডিসেম্বর : মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প

১৯১৬—জানুয়ারি : পল্লীসমাজ (উপন্যাস)

মার্চ : চন্দ্রনাথ (,,)

জুন : বৈকুণ্ঠের উইল (,,)

নভেম্বর : অরক্ষণীয়া (,,)

১৯১৭—ফেব্রুয়ারি : শ্রীকান্ত (১ম) (,,)

জুন : দেবদাস (,,)

জুলাই : নিষ্কৃতি (,,)

১৯১৭—সেপ্টেম্বর : কাশীনাথ (উপন্যাস)
নভেম্বর : চরিত্রহীন (,,)
১৯১৮—ফেব্রুয়ারি : স্বামী (গল্পসমষ্টি)
সেপ্টেম্বর : দত্তা (উপন্যাস)
ঐ : শ্রীকান্ত (২য়) (,,)
১৯২০—জানুয়ারি : ছবি (গল্পসমষ্টি)
মার্চ : গৃহদাহ (উপন্যাস)
অক্টোবর : বামুনের মেয়ে (,,)
১৯২৩—এপ্রিল : নারীর মূল্য (প্রবন্ধ)
আগস্ট : দেনাপাওনা (উপন্যাস)
১৯২৪—অক্টোবর : নববিধান (,,)
১৯২৬—মার্চ : হরিলক্ষ্মী (গল্পসমষ্টি)
আগস্ট : পথের দাবী (উপন্যাস)
১৯২৭—এপ্রিল : শ্রীকান্ত (৩য়) (,,)
আগস্ট : ষোড়শী (নাটক)
১৯২৮—আগস্ট : রমা (,,)
১৯২৯—এপ্রিল : তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ)
১৯৩১—মে : শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)
১৯৩২—আগস্ট : স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)
১৯৩৩—মার্চ : শ্রীকান্ত (৪র্থ) (উপন্যাস)
১৯৩৪—মার্চ : অনুরাধা, সতী, পরেশ (গল্পসমষ্টি)
ডিসেম্বর : বিজয়া (নাটক)
১৯৩৫—ফেব্রুয়ারি : বিপ্রদাস (উপন্যাস)

॥ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থ ॥

১৯৩৮—মার্চ : শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ (সম্পাদিত প্রবন্ধ-সংকলন)
এপ্রিল : ছেলেবেলার গল্প (শিশু গল্প)
জুন : শুভদা (উপন্যাস)
১৯৩৯—জুন : শেষের পরিচয় (উপন্যাস)

১৯৪৮—ফেব্রুয়ারি : শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (সম্পাদিত পত্রাবলী)